কড়িখেলা

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সাড়ে এগারোটার সময় ধীমানদা একটা হাঁক দিয়ে বলল, "জেঠাইমা, এবার আপনি উঠুন, জেঠাকে নিয়ে আমরা রওনা দিই। আই, কে আছিস, জেঠাইমাকে ধরে ভিতরে নিয়ে যা। সরসী, নীলা, তোরা আমার গাড়িতে উঠে পড়। ছাড়, জেঠাকে ছাড়। শনিবারের বারবেলা পড়ে যাবে এর পর, আর দেরি করা যাবে না!"

ধীমানদা এপাড়ার একজন নেতৃস্থানীয় লোক, কংগ্রেস করে। তা ছাড়া পাড়ার ফাংশন থেকে শুরু করে রক্তদান শিবির — সবেতেই ধীমানদার ভূমিকা সঞ্চালকের। জীবনের সব পরিস্থিতির সমস্ত কথাই ধীমানদা বেশ উচ্চৈঃস্বরে কেটে-কেটে বলে থাকে। তবু এই সময় এতটা জোরালো কথাবার্তা শাঁটুলের মতো বেপরোয়া, চোখ-কানকাটা ছেলের কানেও কেমন বিশ্রী শোনাল!

ধীমানদার কথায় কানাই জেঠার বৈঠকখানা ঘরে আরও একবার আছড়ে পড়ল কান্নার ঢেউ। কানাই জেঠার দুই মেয়ে, নীলাদি আর সরসীদি। দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে দু'জনেই কানাই জেঠার মৃতদেহ দু' পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। জেঠাইমা বসে আছেন একটা চেয়ারে, জেঠার পা দুটোকে ছুঁয়ে। জেঠাইমা বেশি কাঁদেননি। লক্ষ করেছে শাঁটুল। বয়সের ভারে বৃদ্ধা নিজেও যথেষ্ট জবুথবু। একটু হতভম্ব গোমুখ। ঘরের মধ্যে বেশ বড় একটা জটলা। পাড়ার কে নেই সেখানে। বেশিরভাগই কানাই জেঠার সমসাময়িক লোকজন। সতু কাকাও রয়েছেন। লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা সতুকাকা নিশ্চয়ই শ্মশানে যাবেন না। তা ছাড়া সতুকাকার হাতে মাছের রক্তের দাগ লাগা থলে। বোঝাই যাচ্ছে, বাজারে যাচ্ছিলেন। ধীমানদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সতুকাকা বলে উঠলেন, "ওরে, আর কেঁদে কী হবে? যে গেছে, সে আর ফিরবে না। তোরা ওঠ, ওঠ, আর দেরি করিস নে, এবার আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।"

শ্মশানে যাবেন না, অথচ 'আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে' বলছেন! শুনে শাঁটুল হাসল মনে-মনে। এই বুড়ো হল সব ঘটে কাঁঠালি কলা। কথাটা বলেই সতুকাকা হাঁপাতে শুরু করেছেন। তাঁর প্রচণ্ড হাঁপানি, বুকটা সব সময় হাঁপরের মতো উঠছে, নামছে। আজন্মকাল হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে বুকের খাঁচা কেমন যেন ঠেলে উঠেছে উপরের দিকে। শাঁটুল লক্ষ করেছে, আম আদমি জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিলে কপালে, নাকে বিজবিজে ঘাম দেখা দেয়। কিন্তু সতুকাকার মতো হেঁপো রোগীরা অষ্টপ্রহর হাঁপালেও তাদের শরীরের উপর চেপে বসে থাকা চামড়ার জিনিসটার কোনও ঘাম-টাম নেই! যেন কেমন ম্যাদা মেরে যাওয়া ঠান্ডা, নির্জীব আর ফ্যাকাসে। হাঁপানির রোগীদের বোধ হয় ঘাম হয়ই না। কে জানে? ভুলও হতে পারে।

সতুকাকার হাঁপানো দেখে কানাই জেঠাদের ভাড়াটে স্নেহাশিসদার বউ ঘোমটা টানতে-টানতে বলে উঠল, "কাকা, আপনি খুব হাঁপাচ্ছেন। একটু শান্ত হোন।"

এই কথায় সতুকাকা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, "ওরে, কানাইদা আমাকে হাত ধরে ইস্কুলে নিয়ে যেত। কানাইদা আমাকে রাস্তা পার হওয়া শিখিয়েছিল। কানাইদা আমাকে কত ঘটি গরম খাইয়েছে। সেই কানাইদা চলে গেল?"

এসব কথা শুনলে শাঁটুলের মনে বরাবরই হাসির ঢেউ ওঠে। চলে গেল মানে? যাবে না? আর কদ্দিন পড়ে থাকবে? ছিয়াশি তো হয়েছিল। বাব্বাঃ, শাঁটুল কখনও এত

দিন পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখবে না! শাঁটুল চায় বেশ তরতরে থাকতে-থাকতে দুনিয়া থেকে কেটে পড়তে। পাড়ায় এত বুড়ো হাবড়া দেখতে-দেখতে বৃদ্ধাবস্থাকে সে প্রায় ঘৃণার চোখেই দেখে! কানাই জেঠা মারা গেছে শুনে তো প্রথম যে কথাটা ভেবেছিল সেটা হল, 'যথেষ্ট!' বেফালতু একটা লোক আর ক'দিন বাঁচবে? বেঁচে থেকে পৃথিবীর ভার বাড়ানো বই তো নয়? টানাটানির অন্ন ধ্বংস করা। এই বয়সে একটা লোক আর পৃথিবীর কোন কাজে লাগবে? তখনই কাউন্টার চিন্তাটা মাথায় এসেছিল তার, কানাই জেঠার ক্ষেত্রে এটা ঠিক। জেঠা সকাল থেকে বেলা বারোটা অবধি রকে ইজিচেয়ার পেতে বসে থাকত, হাতে ধরা থাকত একটা খবরের কাগজ, যে যেত, তাকে ডেকে-ডেকে কথা বলাটা ছিল একমাত্র কাজের মধ্যে কাজ! আবার বিকেল পাঁচটা থেকে ঠিক ওই একই জায়গায় বসে থাকত রাত ন'টা পর্যন্ত।

পশুপতি জেঠার এখনও কত ছাত্র-ছাত্রী, অনেকেই সকাল-সন্ধে আসছে। এই একটা ব্যাপার শাঁটুল ও তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে এক সময় খুব উপভোগ্য ছিল। পশুপতি জেঠার কাছে ভাল-ভাল বাড়ির সুন্দর-সুন্দর মেয়েরা আসত পড়াশোনা সংক্রান্ত সহায়তার জন্য। পি এইচ ডি-র স্টুডেন্ট-ফুডেন্ট আর কী! নিমাই খুড়োর রকে বসে সেসব সুন্দরী মেয়েদের দেখতে কী ভালই না লাগত শাঁটুলদের! একটা চার চোখো মেয়ের তো প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল সে! তখন শাঁটুলের নিজস্ব বাহন ছিল না। তবু বাসে-ট্রামে করেই মেয়েটাকে ফলো করেছিল একদিন। মেয়েটা থাকত দক্ষিণ কলকাতার বর্ধিষ্ণু পাড়া ল্যান্সডাউন রোডে। বরাবরই শাঁটুলের দক্ষিণ কলকাতার মেয়েদের উপর দুর্বলতা আছে। এপাড়ায় তো কিছু কম মেয়ে নেই। গিজ-গিজ করছে। কিন্তু শাঁটুলের চোখে দক্ষিণ কলকাতার মেয়েরাই অসামান্য। টক, ঝাল, মিষ্টি লজেন্সের মতো। সে তুলনায় আমি বুড়োকে এত তোয়াজ করি? দুধটা, ডিমটা ওর পাতে দিই?' সে তো শাঁটুল বিলক্ষণ জানে বেন দেয়! জেঠা ছিল রেলের কেরানি। পেনশন হোল্ডার, বিয়ে-থা করেননি। এমনও অবধি জেঠার পেনশনটাই শাঁটুলদের সাত-আটজনের ফ্যামিলির মেন ইনকাম। বুড়ো মরলেই ইনকাম বন্ধ! ভাগ্যিস নন্দলাল দাস বিয়ে-থা করেনি, এই কথাটা শাঁটুলদের সংসারে সারাক্ষণ অনুচ্চারিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জেঠার কাছ থেকে শেখ যা শাঁটুল হস্তগত করেছে, তা এই লাল ঘোড়া মোটরবাইকটা। এটায় চেপেই শাঁটুল ইদানীং এই চত্বর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কাজকর্ম এখন বেশ ভালই হচ্ছে তার। এ মাসে সে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা পকেটে পুরেছে। আজও রোজকার মতো শাঁটুল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পউিরুটি চাঁচে ভিজিয়ে খেয়ে মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল শ্যামবাজারে এক ক্লায়েন্টকে বাড়ি দেখাতে। অনাদি ঘোষাল স্ট্রিটে ঢুকেই সে জানতে পারল, কানাই জেঠা দেহ রেখেছেন! জেঠা দশ দিন ভর্তি ছিল হসপিটালে। মৃত্যুর কারণ, বয়সজনিত। এখন সাতটা, সাড়ে সাতটা বাজে। ধীমানরা বলল, 'শাঁটুল তোকে দরকার লাগবে।' ব্যস, তার আর কাজে যাওয়া হল না। লালুকে পিছনে বসিয়ে শাঁটুল চলে গেল বাগবাজার ঘাটে, খাট আর ফুল কিনে আনতে। ক্লায়েন্টকে ফোন করে বলে দিল সন্ধেবেলা নিয়ে যাবে বাড়ি দেখাতে। তারপর সে একটা ম্যাটাডোর ভাড়া করল খাল পাড় থেকে, সেখান থেকে গেল আর জি কর। বডি নিয়ে ফেরত আসা ইস্তক সে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এপাড়ায় যত বিপদ আপদ, দুর্ঘটনা, মৃত্যু, ঝগড়া কাজিয়া, লাফড়া, কিচাইন সব কিছুর উপরই শাঁটুলদের একটা ওনারশিপ আছে! স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এখন তারাই পাড়ার সবেধন নীলমণি। সেই ক্লাস নাইন, টেন থেকে শাঁটুল যে কত বার হসপিটাল, নার্সিংহোম থেকে বডি এনেছে, কত বার শ্মশানে গেছে, তার হিসেব নেই। সে তাই দাঁড়িয়ে আছে কানাই জেঠার বাড়ির সামনে। কখন কী কাজের আহ্বান আসে...মাঝখানে দু'বার সে শুধু জগুর চায়ের দোকান থেকে চা খেয়ে এসেছে। সিগারেট টান মেরে এসেছে। একটু আগে মা আর বউদি এসেছিল জেঠাকে শেষ দেখা দেখতে। মা তাকে দেখতে পেয়ে দাঁতে দাঁত চিপে বলল, 'ও, তুই এখানেই তাঁবু গেড়ে বসে আছিস? সকালে বললাম একটু বাজার এনে দে, তখন তো খুব কাজ দেখালি?'

নিমাই খুড়োর রকে বসে সেসব সুন্দরী মেয়েদের দেখতে কী ভালই না লাগত শাঁটুলদের!

শীত, গ্রীষ্ম কুড়ি বছর ধরে ওই একই রুটিন! কিন্তু কানাই জেঠার পাশের বাড়ির পশুপতি জেঠার ক্ষেত্রে কেসটা ঠিক উল্টো। পশুপতি জেঠারও বয়সও আশি হবে। পশুপতি জেঠা পেশাসূত্রে হলেন ঐতিহাসিক, হিস্টোরিয়ান। পাড়ার গর্ব। ইতিহাসের অনেকগুলো মোটা-মোটা বই আছে, জেঠার নিজের লেখা। বাড়ি তো নয়, একটা লাইব্রেরি! এখনও সকাল-সন্ধে জানলা থেকে দেখা যায় জেঠা টেবিলে বসে পড়াশোনা, লেখালিখি চালিয়ে যাচ্ছেন। নিরলস সংগ্রাম! এই তো সেদিন টিভিতে ইন্টারভিউ হচ্ছিল জেঠার। বলছিলেন, 'ইতিহাসের কোলেই মাথা দিয়ে শুয়ে আছি, আর ইতিহাস আমার কানে মৃদু-মৃদু কথা কইছে! বড় রহস্যময় সেই ফিসফাস, খুবই সাংকেতিক এক ভাষা!' এইটুকুই শুনেছিল শাঁটুল, তার বেশি শোনার ধৈর্য ছিল না তার, সে নিজে তো ইতিহাসে পাতি হাঁস! এখানকার মেয়েরা তাকে তেমন চেনে না, যেন বড্ড বেশি জানা। তো সেই পশুপতি জেঠা এখনও, এই বয়সেও মাঝে-মধ্যে পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নানা সভা-সমিতিতে যাচ্ছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন। এই যে মেদিনীপুরে জমি খুঁড়তে গিয়ে তিন ফুট লম্বা কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেল, তাই নিয়ে টিভিতে কত আলাপ আলোচনা, জেঠাকে তো স্টুডিয়োয় যেতেই হল না। বিরাট একটা ও বি ভ্যান দাঁড়িয়ে পড়ল ঠিক এখানে, যেখানে শাঁটুল এখন দাঁড়িয়ে আছে। পশুপতি জেঠার এখনও বেশ ব্যস্ততাময় জীবন। সুতরাং এর মানে দাঁড়াল, কারও-কারও বয়স হলেও সংসারে একটা দাম থাকে। যাকে বলে, একটা উপযোগিতা থাকে। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে, শাঁটুলের নিজের জেঠারও বয়স আশি ছুঁয়ালি এবং মা যে সারাক্ষণ বলে, 'বট্ঠাকুর না থাকলে কি এ সংসারে দু'বেলা হাঁড়ি চড়বে? সাধে কি

মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই শাঁটুল গঙ্গাধরের লঙ্ক্রির ভিতর গিয়ে সেঁধিয়েছিল। মা, বউদি চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে এসেছে। তখন একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়েছিল শাঁটুলের, মা কম্মিনকালেও বাড়ির বাইরে বেরোয় না। মাকে রাস্তাঘাটে হঠাৎ দেখলে শাঁটুল আগেও দু'-একবার চিনতে পারেনি। আজ বউদিকে দেখেই সে মাকে চিনে নেয়। তা-ও মুহূর্ত সময় লেগেছিল!

সতুকাকার আবেগমথিত কথা শেষ না হতেই 'বলো হরি, হরি বোল' ধ্বনি একটা অতীব ভারী কণ্ঠস্বর থেকে ছিটকে উঠল ঘরের মধ্যে। যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, এমনকী শাঁটুল নিজেও চমকে উঠল সেটা শুনে! বাড়ির সামনে ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো ভিড়টা নতুন করে একবার গা ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল কানাই জেঠার বাড়ির গোল রকটার কাছে। আবার একটা ক্রন্দনরোল উঠল। শাঁটুল দেখল, মিস্তিপিসি জেঠাইমাকে ধরে-ধরে বাড়ির ভিতর নিয়ে চলে যাচ্ছে। নীলাদি, সরসীদি আবার একবার জাপটে ধরেছে বাবার মৃতদেহ। ধীমানদা কাঁধ দিল জেঠাকে। শাঁটুল গিয়ে ম্যাটাডোরের ড্রাইভারকে বলল গাড়িটা এনে ঠিক নিমাইখুড়োদের রকের সামনে রাখতে। পাড়ার ভিড়টা বাড়ছে। ম্যাটাডোরের ড্রাইভার গাড়িটা পজিশনে রেখে এবার আর স্টার্ট বন্ধ করল না। এক হাত স্টিয়ারিংয়ে রেখে অন্য হাতে ধরা মোবাইলে লোকটা কথা বলতে-বলতে হাসছে।

ঠিক এই সময় মোহিনীমোহন লাট লেন দিয়ে এসে অনাদি ঘোষাল স্ট্রিটে এন্ট্রি নিল আয়েষাদি। কানাই জেঠার মরদেহ নিয়ে তৈরি হওয়া ছোটখাটো প্রসেশনটাকে ঠেলে-ঠুলে কানাই জেঠার মৃতদেহের পায়ে আলতো হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করে দুদ্দড় করে মোটা-মোটা আল্লালী শরীরটাকে নিয়ে ঢুকে গেল কানাই জেঠার বাড়ির ভিতর, যেতে-যেতে তার দিকে তাকিয়ে আয়েষাদি বলল, "অভীকদাকে দেখেছিস শাঁটুল?"

ঠিক ক'দিন পর আয়েষাদি কথা বলল তার সঙ্গে? এটা মার্চ মাস, পুজোর পর আর সরাসরি তার সঙ্গে আয়েষাদির কথা হয়নি। সামনে পড়ে গেলেও আয়েষাদি এমন ভান করে আজকাল, যেন সে পোকামাকড়! দেখতেই পাচ্ছে না, এত তুচ্ছ! আজ শাঁটুল সেটাই করল, যেটা সে কখনও করেনি আয়েষাদির সঙ্গে! এত বছর, এত অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও, সে জাস্ট মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে হেঁটে গেল নিমাই খুড়োদের রকের দিকে। সে ভাবল, আজকাল আয়েষাদির খুব এসব কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে। পাড়ার কেউ মারা গেলে সাদা সালোয়ার-কামিজ পরে শোকজ্ঞাপন করতে আসে।

ভীষণ নেকা-নেকা লাগে শাঁটুলের এসব। আয়েষা ঘোষ কি হিন্দি সিনেমার নায়িকা যে, কেউ মারা গেলে সাদা কলিদার পরে, চোখে সানগ্লাস দিয়ে দেখা করতে আসতে হবে? এপাড়ায় বহুত আলতু-ফালতু জিনিস আমদানি করেছে আয়েষাদি। পারলে আয়েষাদি শ্বশুর বিশ্বম্ভর ঘোষের টাকায় এই গোটা তল্লাটটাই কিনে নেয়।

ভীষণ নেকা-নেকা লাগে শাঁটুলের এসব। আয়েষা ঘোষ কি হিন্দি সিনেমার বড় নায়িকা?

'বলো হরি, হরি বোল' বলতে-বলতে বড়কাকা, ছোটকাকা, ধীমানদা, শৈলেন চৌধুরি, সকলে মিলে কানাই চাটুজ্যেকে ম্যাটাডোরে তুলে দিল, সবসুদ্ধ জনাদশেক ছেলে ছুটে গেছে। একে-একে তারা সব লাফ মেরে উঠে পড়ছে ম্যাটাডোরে। সবচেয়ে শেষে উঠল ধীমানদা। নিজের মোটরবাইকের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে শাঁটুল লালুকে জিজ্ঞেস করল, "অ্যাই? তুই যাবি তো আমার সঙ্গে?"

অন্য দিন হলে লালু ওর সেই নিজস্ব ভঙ্গিতে আধশোওয়া হয়ে থাকত নিমাই খুড়োদের রকের উপর। লাল তেল চুকচুকে সিমেন্টের বেঞ্চিতে পিঠ ঠেস দিয়ে হাঁটু জোড়া নাক বরাবর তুলে এনে লালু প্রায় শুয়ে পড়ে। দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেয় একটা হাত, অন্য হাতটা সিগারেট ধরা অবস্থায় ঝুলে থাকে বাইরে, লালু চোখ বুজে কিমোয়। আজ নেহাত একটা শোকের ব্যাপার ঘটে গেছে বলে লালু পা ঝুলিয়ে বসে আছে রকে। তার কথায় লালু সিগারেটের টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "চল।"

শাঁটুলের বাইকটা অ্যাকোয়ারিয়ামের গায়ে দাঁড় করানো আছে। এই অ্যাকোয়ারিয়ামটা লালুর খুব মায়ার জিনিস। পনেরো-কুড়ি বছর আগে 'সৌহার্দ্য সংঘ' থেকে গঙ্গাধরের লঙ্ক্রির সামনে এক ঠিলতে বেওয়ারিশ জায়গায় এই অ্যাকোয়ারিয়ামটা তৈরি করে দিয়েছিল। তখন লালু ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়ে। লাল-নীল মাছগুলো দেখতে গিয়ে যাতায়াতের পথে রোজই দাঁড়িয়ে পড়ত অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে। তখন এই নিমাই খুড়োদের রকটা দখলে ছিল বড়কাদাদের। আর যখন সে অবাক হয়ে জলের মধ্যে খেলে বেড়ানো মাছগুলো দেখতে ব্যস্ত, বড়কাদা হঠাৎ করে এসে প্যান্ট খুলে দিত তার! তখন সে খুব বদলা নেওয়ার কথা ভাবত এসবের। সমস্ত অপমানের, অবজ্ঞার, তাচ্ছিল্যের। এদিকে খার থাকলে কী হবে, সে বড়কাদাকে ভয়ও পেত খুব। সে জানত, গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে বড়কাদা গুলি বানায়। গালে গাল-পাট্টা, বড়-বড় চুল, বড়কাদার চেহারাটাও ছিল বাজখাঁই। তা ছাড়া ছোটবেলায় লালুরা বাড়িতে ঠিকমতো খেতে পেত না। না খেয়ে-খেয়ে সে কেমন একটা ক্যাবলা-ক্যাবলা হয়ে গেছিল। কবে যে অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছগুলো মরে গিয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামটা ফাঁকা হয়ে গেল, মনে নেই লালুর। এখন অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরটা শেওলায় কালো হয়ে আছে। কাচের গায়ে মোটা-মোটা শুঁড়ের মতো বেয়ে-বেয়ে উঠেছে শেওলা। বড়কাদা লোকটাও হেমন্ত সেতুর উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে আসতে গিয়ে একদিন বাস চাপা পড়ে মরেছে। প্রকৃতপক্ষে এখন লালু নিজেও ছোট-ছোট বাচ্চাদের খচানোর জন্য অনেক সময় প্যান্ট খুলে দেয়। এটা একটা পুরনো খেলা, যা বড়রা ছোটদের সঙ্গে খেলেই থাকে! কিন্তু এখনও সে প্রায়ই ভাবে, অ্যাকোয়ারিয়ামটা পরিষ্কার করবে একদিন। ক'টা রঙিন মাছ ছাড়বে। কিন্তু হয়ে আর ওঠে না!

লালু ভাবছিল, এই একটা মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পাড়ায় বেশ নাটক হচ্ছে। কানাই চাটুজ্যের মড়ার গলাতে সাত-আটটা মালা? ভাবা যায় না! কুঁড়ে আর কেক্কন,

'কানাই চাটুজ্যে' বলতে এই তো বোঝায়! কোনওদিন তিথিরিকে একটা পয়সা দিয়ে দেখেছে বুড়োটা?

ম্যাটাডোরটা চলতে শুরু করেছে। সরসীদির বর 'বলো হরি, হরি বোল' বলতে-বলতে কানাত শব্দে কিছু খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দিল রাস্তার উপর।

লালু সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "যাঃ শালা, সব পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা! সব অচল পয়সা রে শাঁটল! জমিয়ে রেখেছিল।"

শাঁটল বলল, "যাবি তো চল রে লালু!"

শাঁটলের মুখে অন্য উন্নীপনা। শ্মশানে যাওয়ার একটু নেশা আছে ওর।

লালু বলল, "আজ আমার সকাল থেকে পেটটা বসে গেছে। যাওয়ার পথে 'পপুলার' থেকে কিছু একটা ওষুধ নিতে হবে।"

ম্যাটাডোরটা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। লালু চড়ে বসল শাঁটলের ঘোড়ার পিছনে। বাম্ শব্দে স্টার্ট দিল শাঁটল বাইকটা। এখন রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোর বারান্দায়-রকে নানা মুখ। সকলেই কানাই ক্ষেত্রীর শেষযাত্রার সাক্ষী হচ্ছে। প্রদীপদার দু' বছরের ছেলেটা খুব নমো-নমো করছে। ঠিক তখনই ভবেশ মিত্তিরের বাড়ির সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এল কমলের বউ। কমলের বউকে অচানক দেখতে পেয়ে শাঁটলের বাইক প্রায় অ্যাক্সিডেন্টই করছিল শনি মন্দিরের গায়ে গিয়ে! খুব জোর বেঁচে গেল। কমলের বউয়ের নাম সোহিনী। আর শাঁটল তার নাম দিয়েছে সোহিনী সাউথ। সাউথ থেকে বিয়ে হয়ে নর্থে এসেছে মেয়েটা। শাঁটলের ধারণা, সাউথের মেয়েরা অন্যরকম হয়। সবাই জানে, বিয়ে করলে শাঁটল সাউথের মেয়েকেই করবে। রায়বাগানের এই ইট বের করা বাড়ি, এঁদো গলির চেয়ে সাউথ ক্যালকাটা কত আলাদা! সোহিনী সাউথের যেখানে থাকে, সেটা মুদিয়ালি। মুদিয়ালি জায়গাটা দারুণ। ঝকঝকে রাস্তাঘাট, সুন্দর-সুন্দর বাড়ি, বড়-বড় গাছ, চওড়া বুলেভার্ড। সোহিনী ওই মুদিয়ালির মতো, এপাড়ার তুলনায় চোখটাঁদানো গ্র্যামার, হাঁটাচলা, আদবকায়দা, পোশাকআশাক, কথা বলা, সবই আলাদা। এমনকী, ওর বিয়ের দিন শাঁটল ফুলের স্তবক দিতে গেলে সোহিনী সাউথ যে হাসিটা হেসেছিল, সেটাও মারাত্মক ছিল! হেভি পার্সোনালিটি। এককথায় বলতে গেলে শাঁটল-লালুরা এত স্মার্ট মেয়ে আগে কখনও দেখেনি! তাদের কাছে এই স্মার্টনেস, এই ঝাঁ চকচকে উপস্থিতি রোমহর্ষক, উত্তেজক!

লালু জানে, হঠাৎ করে সোহিনীকে দেখলে শাঁটল সেই চাপা উত্তেজনায় চিতাবাঘের মতো হয়ে যায়। গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে চায় কমলের বউটার একদম ঘাড়ের কাছে। চোখ টানটান করে থমথমে মুখে তাকিয়ে থাকে। কৌতূহল জলের মীনের মতো সুরুত-সুরুত করে আনাগোনা করে ওর চোখে। কমলের বউয়ের প্রতি শাঁটলের এই বেপরোয়া আচরণ খুব এনজয় করে লালু। শাঁটল ছটফট করলে তার খুব মস্তি হয়। আর যেহেতু সে শাঁটলের সত্যিকারের বন্ধু, তাই সে সাবধানও করে শাঁটলকে বাড়াবাড়ি না করাতে। এপাড়ায় সকলেই সকলের দিকে নজর রাখে। কমলটা যতই ম্যানামার্কা হোক, সোহিনী তো কমলের বউ। আর 'বউ' মানেই তো সম্পত্তি। ভোগ-দখলের সম্পত্তি! লালু দেখল, ফাটাফাটি ড্রেস করেছে সোহিনী আজ। সোহিনীর টকটকে ফর্সা গায়ের চামড়ায় যেন কেটে-কেটে বসে গেছে কালো ব্লাউজটা। একটা সাদা-কালো চেক-চেক শাড়ি পরেছে। শ্যাম্পু করা একটু বাদামি রঙের চুল খোলা অবস্থায় যেন লকলকিয়ে উঠছে কাঁধের উপর। চোখে সানগ্লাস। পায়ে পেনসিল হিল, হাতে একটা চমৎকার হ্যান্ডব্যাগ। ঠোঁটে কী একটা লিপস্টিক লাগিয়েছে, রোদে ঝলসে উঠছে পাকা-পাকা টসটসে দুটো ঠোঁট। সেই ঠোঁটে সামান্য ঢেউ তুলে, হিলে শব্দ তুলে সে হেঁটে যাচ্ছে তিন মাথার মোড়ের উদ্দেশ্যে। আর শাঁটল এলোমেলো বাইক চালাচ্ছে। হঠাৎ গতিটা বাড়িয়ে দিয়ে শাঁটল সোজা বউতলার ট্যারি স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। লালু দেখল, শাঁটলের চিবুক শক্ত, মাথার দু' পাশের রগ ফুলে উঠছে। সে নেমে দাঁড়াতে যাচ্ছিল বাইক থেকে। শাঁটল তার পায়ে চাপড় মারল, "বসে থাক।"

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল লালু, "শ্মশানে যাবি না?"

"নাঃ!" বলল শাঁটল।

"দ্যাখ শাঁটল, বাড়াবাড়ি করিস না। পাড়ার বউ, বন্ধুর বউ পরস্ত্রী, সমবে চল। কমলের বউকে দেখলে তুই যে এরকম করিস, তা কিন্তু অনেকেরই নজরে পড়েছে। সেদিন করে বসে তুই কমলের বউকে নিয়ে যেসব মন্তব্য করছিলি, সকলেই বুঝতে পারছিল, তোর একটা অন্যরকম ইন্টারেস্ট আছে!" নাকের কাছে উড়ে আসা একটা মাছি তাড়াতে-তাড়াতে বলল লালু। সে দেখল, ওই তিন মাথার মোড় থেকে বাঁ হাতে ঘুরল সোহিনী সাউথ। এদিকেই আসছে। ট্যারিতে উঠবে, জানা কথা।

শাঁটল তাকিয়ে থাকতে-থাকতে খুব বিদ্বেষপূর্ণ স্বরে বলল, "উল্টো দিকের বাড়িতে একজন মারা গেছে, তার বডি এখনও পাড়া থেকে বেরতে পারল না। কমলের বউ শব্দে মধ্যে এত মাজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল? মেয়েটার কি কোনও চক্ষুলজ্জা নেই? এই জন্য কমলের মা বউকে দেখতে পারে না! আরে, এটা তো সাউথ ক্যালকাটা নয়, এখানে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে লোকের জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক, এই বউটা সেসব তো মানতেই চায় না!"

"এসব মেয়ে এরকমই! কোনও নিয়মকানুন মানলেওয়ালি ঘোড়ি! অহংকারে মট-মট করছে!" লালু সত্যি ভেবেই বলল কথাটা।

শাঁটল চোখটা সরু করে তাকাল, "তাই না? আমার বউ হলে দেখিয়ে দিতাম! এত ছটফটানি বের করে দিতাম। কমলটা তো একটা ছাগল। এসব জান্তু ক্লাচ্সীকে কি কমল-টমল হ্যান্ডল করতে পারে?"

'আমার বউ হলে' কথাটার মধ্যে অসম্ভব একটা কাম ভাব রয়েছে, বুঝল লালু। অবদমিত কাম। সে আত্মসংবরণ না করে বলল, "তোর বউ হলে আর কী করতি? বল শালা?"

শাঁটল খুব শান্তভাবে বলল, "প্রথমেই থাই দুটো দেখতাম একটু। দু' হাতে দলাইমলাই করতাম!"

শাঁটলের মধ্যে তৈরি হওয়া অমানুষিক ইচ্ছেটা পড়তে পারল লালু। সে বলল, "শালা তোকে পুরো হড়কে দিয়েছে। তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে!" বলে গলাটা বিকৃত করে হাসল একটু।

শাঁটল বলল, "দাঁড়া তো! আজ কমলের বউটাকে ফলো করতে হবে। প্রায় দিন এরকম ভরদুপুরে সেজেগুজে কোথায় যায় জানতে হবে!"

লালু বলল, "দ্যাখ শাঁটল, আমি এই ফলো করাকরিতে নেই। যদি শ্মশানে যেতে হয় চল, যাচ্ছি। নইলে আমার বিস্তর কাজ আছে। একটু পরেই অভীকদা আমাকে খুঁজবে।"

"ভাগ শালা অভীকের পেয়াদা! আমাকে দ্যাখ। নিজের মর্জির চাকর, অন্যের নই! তোকে কত দিন ধরে বলছি, অভীকদাকে ছাড়, আমার লাইনটা ধর! আমারও চাপ বাড়ছে। একটা হেল্প হলে ভাল হয়, শেয়ার থার্টি, সেভেন্টি! তুই শুধু পার্টিকে বাড়িগুলো দেখিয়ে দিবি, ব্যস!"

দুপুর তিনটে নাগাদ অভীকদা লালুকে ট্যাভেল এজেন্সিতে যেতে বলেছে। অভীকদার বাবা-মা দিল্লিতে কোনও

আত্মীয়ের বিয়েতে যাবে, টিকিট কালেক্ট করে টাকাপয়সা মিটিয়ে আসতে হবে। লালুর কোনও সাকরিবাকরি নেই। অভীকদা, আয়েষাদির ফাইফরমাশ খেটেই দিন চলছে তার। আয়েষাদির আজকাল হেভি মেজাজ হয়েছে। পান থেকে চুন খসলেই ডাঁটো-ডাঁটো বাক্যি ঝাড়ে। লালু বলল, "অভীকদাকে আমি চটাতে চাই না। মাস গেলে চার-পাঁচ হাজার এসে যাচ্ছে, আমার এতেই যথেষ্ট!"

শাঁটুল বলল, "তোর শাঁটুল বাসের মতো এলেন নেই। তোর বুকটা চড়াই পাখির বুক হয়ে গেছে লালু! তুই অভীকদার পুরো চাকর বনে গেছিস। তোর লজ্জা করে না? সেদিন দোলের আগের দিন রাতে সজলদাদের ছাদে মাল খেতে-খেতে অভীকদা বলল, 'লালু একটু পিঠটা ম্যাসাজ করে দে তো!' তুই অমনই অভীক ঘোষের গাত্র মর্দনে লেগে গেলি! ছিঃ লালু , ছিঃ, ছিঃ! রোজ তোকে দিয়ে অভীকদা গা হাত-পা টেপায়!"

মিত্রের কাছে কোনও পাত্তা পায় না। বছর দু'য়েক আগে তখন সোহিনী সবে বিয়ে হয়ে এসেছিল, আয়েষাদি সোহিনীকে দলে টানতে চেয়েছিল। পুজোর ফাংশনে নাচতে বলেছিল সোহিনীকে। তাতে সোহিনী খুব বিরক্ত হয়ে ভ্রু তুলে বলেছিল, 'আমার গুরুর নাম বিজেশ মহারাজ, তুমি ভাবলে কী করে আমি এসব পাড়ার ফাংশনে নাচব?' আরও একটা জায়গায় আয়েষাদিকে পুরো নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে সোহিনী সাউথ। সোহিনী সাউথ তুখোড় ইংরেজি বলে। আর আয়েষাদি যতই বড়লোকের বউ হোক, আসলে তো তাদের মতোই গরিব বাড়ির মেয়ে। গোলক মাঝি লেনে থাকত, পড়েছে মনোমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ে, বাংলা মিডিয়ামে। সোহিনী তরতর করে ইংরেজি বললে আয়েষাদি বাক্যহারা হয়ে যায়! যারা সামনাসামনি আয়েষাদিকে সবচেয়ে বেশি তোল্লাই দেয়, তারাই এই নিয়ে পিছনে হাসাহাসি করে।

সোহিনী সাউথকে রিফিউজি করছে? লোকটা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল?" লালু বুঝে গেল, এর পর কী হতে চলেছে, স্টার্ট বন্ধ করে মোটর বাইকটা তাকে ধরিয়ে দিয়ে শাঁটুল হেভি রেলা নিয়ে হেঁটে গেল ট্যাক্সিটা অবধি। জানলায় হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে বলল, "কী ব্যাপার? কোনও প্রবলেম?"

সোহিনী সানগ্লাস পরা চোখমুখ তুলল শাঁটুলের দিকে, এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর কোনও উত্তর না দিয়ে সটান নেমে এল ট্যাক্সি থেকে। আর হন-হন করে হাঁটতে লাগল ব্রিজের দিকে। ব্যস, হেভি বোকা বনে গেল শাঁটুল! সোহিনীর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে সে আচমকাই মাথা গরম করে ফেলে দুম করে একটা ঘুষি মেরে বসল ড্রাইভারটাকে!

মোটরবাইকটা ঠিক করে রেখে লালু ছুটে গেল ঝামেলা সামলাতে। ড্রাইভারটাও হাতা-ফাতা গুটিয়ে নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। ব্যাপার অনেক দূর গড়াল, লোকজন জমে গেল। পাড়া, তাই দু'-চারটে চড়-থাপ্পড় খেয়ে ট্যাক্সিওয়ালা পালাল ব্যাপারটা ছেড়ে। ততক্ষণে আধঘণ্টা সময় বয়ে গেছে বি টি রোডের সামনে দিয়ে। অতঃপর কিংকর্তব্য? নাকের পাটা ফুলিয়ে শাঁটুল রাস্তার দু'পাশে। তারপর শ্যামবাজারের জনারণ্যে সোহিনীকে খুঁজতে-খুঁজতে পৌঁছে গেল কাশী মিত্তির ঘাটে।

সোহিনী সানগ্লাস পরা চোখমুখ তুলে শাঁটুলের দিকে তাকিয়ে রইল। পরে নেমে এল ট্যাক্সি থেকে।

॥ ২ ॥

সত্যি একদম কাছে চলে এসেছে সোহিনী সাউথ! হাঁটার ছন্দে দুটো ভরাট সুডৌল উরু ফুটে-ফুটে উঠছে, দুটো সাদা নিটোল লম্বা-লম্বা হাতে ঝিকিয়ে উঠছে সোনার অলংকার। বালা না বাউটি, কী যেন বলে। লালুর কোনও জ্ঞান নেই এসব বিষয়ে। তার মায়ের হাতে তো আজীবন শুধু ক্ষয়ে যাওয়া রোজের চুড়ি! 'গয়না' বললে লালুর বরং আয়েষাদির কথা মনে পড়ে। গয়নার বিজ্ঞাপনের চেয়েও বেশি গয়না পরে আয়েষাদি! আচ্ছা, সোহিনী সাউথকে কি আয়েষাদির চেয়ে বেশি ভাল দেখতে? তবে এটা এখন সকলেই জানে, বিশ্বম্ভর ঘোষের একমাত্র ছেলের বউ আয়েষা ঘোষ সোহিনী সাউথকে বেশ ঈর্ষার চোখে দেখে। এপাড়ায় আয়েষাদির প্রবল প্রতাপ-প্রতিপত্তি। যেমনটা একসময় ছিল আয়েষাদির শ্বশুর বিশ্বম্ভর ঘোষের। আয়েষাদি যেন শ্বশুরের জায়গাটাই নিয়েছে। সেই আয়েষাদি একমাত্র সোহিনী বটতলায় এই সময় ট্যাক্সির সংখ্যা হাতে গোনা। সর্বসাকুল্যে দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। একটা এইমাত্র প্যাসেঞ্জার তুলে চলে গেল। শাঁটুল এমনভাবে বটগাছের আড়ালে 'সারদেশ্বরী' প্রিন্টিং প্রেসের চাতালে ঢুকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তারা সোহিনীকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সোহিনীর পক্ষে তাদের দেখা সম্ভব হচ্ছে না। ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে উঠে বসল সোহিনী, অমনই স্টার্ট দিল শাঁটুল বাইকে। লালু একশো আশি ডিগ্রি চোখ ঘুরিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, ব্যাপারটা কে-কে লক্ষ করছে! 'সারদেশ্বরীর' বুড়ো ম্যানেজারটা চোখে মোটা পাওয়ারের চশমা পরে হাতের কাজ থামিয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। কিন্তু সোহিনী ট্যাক্সিতে উঠে বসলেও ট্যাক্সি তো এগোচ্ছে না। লালু ভাবল, ট্যাক্সিটা কি যেতে চাইছে না? সোহিনী কী একটা বোঝাচ্ছে ড্রাইভারকে। শাঁটুল বলল, "কেসটা কী? হারামিটা কি খুব ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শর্মিলার। ঘোরের মধ্যে উঠে বসে সে জোরে জোরে নাক টানতে লাগল, আঃ, আঃ! চারিদিকে একটা ম, ম, গন্ধ! নিম-বেগুন ভাজার গন্ধ। গন্ধটা যে নিম-বেগুন ভাজার সেটা অনুধাবন করতেই ঘুমের ঘোরটা সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছিল শর্মিলার। এই আঠাশ তলার বিল্ডিংয়ে কার ফ্ল্যাট থেকে নিম-বেগুন ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে? এখানে তো বাঙালি প্রায় নেই বললেই চলে! হাতে গোনা! আশেপাশে একটাও বাঙালি নেই। আর থাকলেও এত ভোরে ওট-মিল্ক, কর্নফ্লেক্স দিয়ে ব্রেকফাস্ট করার বদলে কে নিম-বেগুন খাবে? এই কমপ্লেক্সের বাঙালিদের লাইফস্টাইল তো আন্তর্জাতিক মানের। গন্ধটা তাকে পাগল করে দিচ্ছিল! ইচ্ছে করছিল, গরম ভাত নিয়ে তাতে নিম-বেগুন ভাজা মেখে খায়। হালকা সবুজ তেল গড়িয়ে আসবে মাখার সময়। মামি কী মুচমুচে করে ভাজত

নিমপাতাগুলো, তেতোর আস্বাদও যে অমৃতর মতো হতে পারে, তা মামির নিম-বেগুন খেলে বোঝা যায়।

গায়ত্রীর কথা মাথায় আসতেই মেরুদণ্ডে একটা টক্কা লাগল শর্মিলার। ও হো, সে তো গায়ত্রীরই স্বপ্ন দেখছিল এখন! ঠিক গায়ত্রী নয়, মামাবাড়ির পাড়ার স্বপ্ন, অনাদি ঘোষাল স্ট্রিটের বাড়ি, শিবমন্দির, চিলড্রেন্স পার্ক, পোলের তলা, রেলমাঠ, রায়বাগান, সরকার বাগান — সব মিলিয়ে-মিশিয়ে একটা বড়সড় পটভূমি। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখছিল, রাধাদিদের বাড়ির সামনের রকে বসে সে বেলা পার করে আড্ডা দিচ্ছে তো দিচ্ছে আর গায়ত্রী কুণ্ডুবাড়ি পাঁচিলের ওপাশ থেকে ডাকছে তাকে, 'ভানু ভাত খাবি আয়। নিম-বেগুন ভেজেছি ভানু, খাবি আয়।'

শর্মিলা অবাক হয়ে বসে রইল, স্বপ্নের নিম-বেগুনের গন্ধ এত তীব্র হয়ে নাসারন্ধ্রকে উত্তেজিত করে? সে আবার শুঁকল বাতাস, হ্যাঁ, এখনও স্পষ্ট গন্ধটা ভঙ্গিমা। সেই অবস্থাতেই চোখ বড়-বড় করে পলক ফেলল, "কী বলছ? নিম-বেগুন?"

"হ্যাঁ? গন্ধ পাচ্ছ?"

সোজা উঠে বসল আদিত্য, "শর্মিলা, তুমি না প্লিজ ন্যাকামি করাটা বন্ধ করো।"

আহত দৃষ্টি মেলে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে রইল শর্মিলা, "বিশ্বাস করো, আমি একদমই ন্যাকামি করিনি। ঘুম ভেঙে গেল একটা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নে দেখলাম ছোট মামি আমাকে নিম-বেগুন ভাজা দিয়ে ভাত খেতে ডাকছে। তারপর এখনও আমি স্পষ্ট এখানে ওই নিম-বেগুন ভাজার গন্ধ পাচ্ছি। এটা কী করে সম্ভব? ভীষণ অবাক হলাম বলেই তোমাকে ডাকলাম।"

আদিত্য একটু নরম হল, "না, আমি কোনও গন্ধ-টন্ধ পাচ্ছি না। আর শর্মিলা, ঘুম ভাঙিয়ে তুমি একথা জিজ্ঞেস করছ? আচ্ছা, তোমার বয়স না হয় বাড়েনি, তুমি কচি খুকিটি হচ্ছ। কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে, সারাদিন এত পরিশ্রম করতে হয়, আমার ঘুমে ঘাবা না বসালেই আর চলছিল না?"

শর্মিলা চুপ করে গেল। আজকাল আদিত্য তাকে সামান্য-সামান্য কারণেই খুব বকাবকি করে। শর্মিলা বুঝতে পারল না, একদিন আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে ডেকে তুললে কি এমন অন্যায় করা হয়! সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। আদিত্য আর শুল না, নেমে গেল বিছানা থেকে। অতঃপর প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত হল।

শুয়ে-শুয়ে শর্মিলা ভাবতে চেষ্টা করল, স্বপ্নটা ঠিক কী ছিল? কোথা থেকে কোথায় ঘুরছিল স্বপ্নটা। ভাবতে-ভাবতে মৃদু হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। স্বপ্নে সে যখন রাধাদিদের রকে বসে গল্প করছে তখন জানলা দিয়ে দু'-দু'বার রাধাদির মা পানের পিক ফেলেছে। রাধাদির মা কি এখনও বেঁচে আছে?

ছ' বছর আগে যখন শর্মিলা অনাদি ঘোষাল স্ট্রিট ছেড়ে চলে আসছে তখন তো রাধাদির মা বেঁচেই। এই ছ' বছরে তার সঙ্গে গায়ত্রীর ফোনে কথা হয়েছে। কিন্তু সেরকম খোশগল্প তো হয়নি কখনও যে, পাড়া-প্রতিবেশীর খবর নেবে। আর শুধু রাধাদির মা-ই কেন, ও পাড়ার বুড়োবুড়িদের কত জনই যে এই ছ' বছরে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, তাই বা কে জানে?

শর্মিলা এমনই-এমনই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল! ভাবল, আজ অফিসে পৌঁছে গায়ত্রীকে একটা ফোন করবে। অনেক দিন তো কথাই হয়নি। তখন জিজ্ঞেস করবে রাধাদির মা'র কথা। কানাই জেঠাও তাকে বড় স্নেহ করতেন। বাপ-মা মরা মেয়ে, একটু খোঁজখবর নিতেন। কানাই জেঠার কথাও একবার জানতে চাইবে শর্মিলা। কবে যেন একদিন নিউ মার্কেটে দেখা হয়েছিল সরসীদির সঙ্গে। ঢাকা-লামা থেকে রুপোর গয়না কিনছিল শর্মিলা। আদিত্য খুব পছন্দ করে এসব সাজ। সরসীদি খুব তাড়াহুড়ো করে দু'-একটা কথা বলেই চলে গেল। কানাই জেঠার কথা জিজ্ঞেসই করা হল না তার। তবু মনে আছে, তারই মধ্যে সরসীদি তার কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিল, 'দেখে তো মনে হয় ভালই আছিস?' সে হাসতে চেয়েছিল, পারেনি। কেন কে জানে? তার ভাল থাকার মধ্যে একটা হুল ফুটে আছে প্রথম থেকেই।

আদিত্য গার্গল করছে, তার মানে যোগ-টোগ হয়ে গেছে। শর্মিলা ভাবল, মাঝে-মাঝেই বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে তার গাড়িতে গিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয়, কিছু একটা তাকে পিছন দিকে টানছে। পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটতে-হাঁটতে ইচ্ছে করে ভিড়ে ঠাসা মেট্রোয় চড়ে বসে, শ্যামবাজার স্টেশনে গিয়ে নামে। সে মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, শ্যামবাজার থেকে হাঁটতে-হাঁটতে সে পোলের দিকে যাচ্ছে, তারপর ব্রিজ থেকে নেমে গেল। তখন পোস্ট অফিসের জরাজীর্ণ বাড়িটার দরজা বন্ধ হচ্ছে, জঙ্গর চায়ের দোকানের সামনে ভীষণ ভিড়, ভীমের দোকানে চুবড়িতে পড়তে না-পড়তেই উড়ে যাচ্ছে সোনালি গরম-গরম চপগুলো, তখন জ্যোতিষ্মানন্দ লাইব্রেরির দরজা খুলে জলের ছিটে দিচ্ছে, তখন সে-ও পৌঁছে গেছে পাড়ায়!

এই ইচ্ছেটা ইচ্ছেই থেকে যায়! ছ' বছরে টান যত বেড়েছে, যাওয়া কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া আদিত্যকে জানিয়ে তো যাওয়া যায় না। আদিত্য মত দেবে না। তার জীবনের সব বিষয়ে আদিত্যর মতামতের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু আদিত্যর জীবনের অনেক ব্যাপারেই তার

শর্মিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল! ভাবল, আজ অফিসে পৌঁছে গায়ত্রীকে একটা ফোন করবে।

পাচ্ছে সে! তখনই তার মনে হল, হয়তো গন্ধটা শুধুমাত্র তার কল্পনা নয়, কোথাও সত্যিই ভাজা হচ্ছে নিম-বেগুন! শর্মিলা আদিত্যর দিকে তাকাল একবার। আদিত্য এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না। ছ'টায় উঠে পড়ে মুখ-টুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে প্রপার ট্র্যাক প্যান্ট-ট্যান্ট পরে গেস্ট রুমে রাখা ট্রেড মিলে দৌড়বে আধঘণ্টা। তারপর কিছু যোগাসন করবে। তারপর নিজেই জল গরম করে গার্গল করবে এবং এসব সেরে চায়ের জল বসিয়ে তাকে ডাকবে। কিছু না ভেবেই শর্মিলা আদিত্যকে ঠেলা দিল, "আই শুনছ? শোনো না?"

এক ডাকাতেই চোখ মেলল আদিত্য, "কী?"

"আচ্ছা, তুমি কি নিম-বেগুন ভাজার গন্ধ পাচ্ছ?"

বুকের উপর দু'টো হাত জড়ো করে শুয়েছিল আদিত্য, এটাই তার শোওয়ার

মতামতটা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। আর তাকে ওপাড়ায় কেউ ডাকেও না। গায়ত্রী কি কখনও জোর দিয়ে বলেছে, 'আসবি না কেন, আয়! কত দিন দেখিনি তোকে!' শর্মিলার চোখে জল চলে এল! জলে চোখ ভরে উঠল, কিন্তু গড়িয়ে বালিশে পড়ে গেল না। উপরন্তু সুড়সুড়ি দিতে লাগল চোখে। সে ভাবল, আর একটু জল এলেই জলটা উপচে পড়তে পারত চোখ থেকে। কিন্তু আজকাল কী হয়েছে, চোখে জল এসেই তারপর অশ্রু শুকিয়ে যায়। পরিপূর্ণ একটা কান্না সে অনেক দিন কাঁদেনি। আসেই না! তার দুঃখের কি গভীরতা নেই কোনও? নাকি আদিত্যর সঙ্গে থেকে-থেকে সে ভিতরে-ভিতরে সত্যিই এতটা বদলে গেছে যে, চোখে জল আসামাত্রই যুক্তির ব্লটিং পেপার ফেলে সেই জলকে অসঙ্কোচে শুষে যেতে বাধ্য করে! যুক্তি? আদিত্য খুব যুক্তিবাদী। শর্মিলা পড়াশোনায় খারাপ ছিল না। ভাল রেজাল্টই করত। কিন্তু সে তো বই মুখস্থ করে থরে-থরে উত্তর লিখে আসা। তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার জগৎ বলে কিছু ছিল না কখনও। নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধি বলেও তার কখনও কিছু গড়ে ওঠেনি। আদিত্য যা বলে, এতদিন সে শুধু সেটাই বিশ্বাস করে এসেছে। ভেবেছে, সেটাই সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ!

ইদানীং অবশ্য সে আদিত্যর সব যুক্তি মেনে নিতে পারছে না। যেমন তাকে না বলে আদিত্যর সিঙ্গাপুর যাওয়ার যুক্তিটা। আসলে তাকে না বলে আদিত্য কেন সিঙ্গাপুর গেল, সেটা তো মনে-মনে সে নিশ্চিতভাবে জানে! জানে না? তা-ও না বলে যাওয়ার ব্যাখ্যা শুনতে চায় কেন? এটুকুও না জিজ্ঞেস করলে, এই সামান্য চাপটুকুও না রাখলে শেষ অবধি তার পরিণতি কী হবে, এই ভেবেই তো? কী অদ্ভুতভাবেই না আদিত্যর সিঙ্গাপুর যাওয়ার খবরটা পৌঁছল তার কাছে! অথচ তার জানার কথাই নয়।

কিচেনের আওয়াজে শর্মিলা বুঝল, আদিত্য চায়ের ট্রে গোছাচ্ছে। উঠে চোখ-মুখ ধোওয়ার বদলে শর্মিলা ঘুমের মধ্যে আর একবার তলিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল! কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আদিত্য তাকে তুলে দিল এসে। এখন সবই একটু বদলে-বদলে গেছে। কিন্তু এই সেদিনও আদিত্য ঘুম থেকে তুলে তার হাতে চায়ের কাপ দিলে, সে তার কাঁধ পর্যন্ত স্টেপ কাট চুলের গুছি দু' হাতে জড়িয়ে দু' কানে গুঁজে, বেশ নড়ে-চড়ে বাবু হয়ে বসে কাপ নিত হাতে। খুব আদুরে ভাব করত এই সময় শর্মিলা। আদিত্যর ব্যবহারটাই ছিল এরকম তার সঙ্গে। প্রায়শই স্নেহপ্রবণ! শাসনপ্রবণ! দু'জনের বয়সের প্রচুর পার্থক্যটাই তার কারণ, স্বাভাবিকভাবেই! আদিত্য আর সে প্রায় ১৮ বছরের ছোট বড়। আজ বেমক্কা অকারণে ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার জন্য শর্মিলা ভেবেছিল তাকে দ্বিতীয় আর এক দফা বকাবকা শুনতে হবে আদিত্যর কাছে। কিন্তু চায়ের ট্রে বিছানায় নামিয়ে রুমের পর্দা-টর্দা সরিয়ে জানলাগুলো সব খুলে দিতে-দিতে আদিত্য রোদ পড়া চোখ কুঁচকে আপনমনে হাসল একবার, লক্ষ করল শর্মিলা।

আদিত্য বলল, "সকালে কী স্বপ্ন দেখছিলে? নিম-বেগুন ভাজা খেতে ইচ্ছে হয়েছে?"

সে একটু মিটিমিটি করে তাকাল আদিত্যর দিকে। একটু অভিমান গলায় এনে বলল, "ইচ্ছে হলেই বা! তোমার তো আবার ওসব পছন্দই নয়। আমি তো বাজারে যাই না। তুমি যাও, তোমাকে বললে তুমি আনবে?"

একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বিছানায় এসে বসল আদিত্য। প্রায় ৫৩ বছর বয়স হল আদিত্যর। কিন্তু যোগ-টোগ করে চেহারাটা একদম তকতকে রেখেছে, নির্মেদ টানটান শরীর। বড়-বড় চোখগুলোয় একটা বুদ্ধির তরলতা। যেটাকে চালাকের লক্ষণ বলতে পারে অনেকে। অন্তত ছোটমামা তো আদিত্যকে দেখে তাই বলেছিল, "ভীষণ চালাক লোকটা। এ তোকে এক হাটে কিনে দশ হাটে বেচে দেবে ভানু!" মামি বলেছিল, "তা চালাক হবে না? এত বড় ব্যবসা করে, কত লোক চরিয়ে খায়। তা ভানুই কি কম চালাক নাকি? এত বড় একটা লোককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে কি এমনই-এমনই?" গায়ত্রী পানের রসে ভেজা ঠোঁট টিপে হেসেছিল, "ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরচ্ছে বিদ্যেধরী ভাগ্নী তোমার!" আসলে পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল শর্মিলা। অনেক নম্বর পেত। তাই সকলেই ভাবত, তার মাথায় গজগজ করছে বুদ্ধি। কিন্তু বইয়ে পড়া বিদ্যে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত সংসারের বিষাক্ত পরিবেশে যে কোনও কাজেই লাগে না, তা শর্মিলা খুব ভাল করে জানে এখন।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে আদিত্য খুব খেলিয়ে-খেলিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে বলল, "'আনব না কেন? বললেই আনব! দুপুরবেলা গরম-গরম এক থালা ভাতে নিম-বেগুন ভাজা মেখে খাবে। তারপর মাছের কাঁটার চচ্চড়ি খাবে। তারপর আর কী যেন খেতে তোমার মামাবাড়িতে? মাছের ডিমের টক! আঙুল চাটবে, তারপর টিভিতে বাংলা সিনেমা দেখবে 'সাত পাকে বাঁধা।' বিকেলে দেড়শো টাকা কেজির চা খাবে চিনি গুলে, আর কী-কী? বাসে করে সতেরোটা লোকের কনুই-এর গুঁতো খেতে-খেতে অফিস যাবে, বসন্ত কেবিন না কোথায় পর্দা টানা কেবিনে বসে কাটলেট খাবে! শুধু নিম-বেগুন খেলে কি সাধ মিটবে তোমার শর্মিলা?" দামি পোর্সেলিনের সুগার পটের ঢাকনা সরিয়ে চায়ে আর এক চামচ চিনি মেশাতে যাচ্ছিল শর্মিলা। আদিত্যর টিকা-টিপ্পনিতে সে হতবাক হয়ে হাত সরিয়ে নিল! ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল আদিত্যর মুখের

দিকে। সকাল সকালই তাকে ভাষণ দিতে পেরে আদিত্যর লালচে ত্বক যেন আরও চকচক করে উঠছে। অন্যকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে পারলে আদিত্য আর কিছু চায় না। এটাই আদিত্য রায়ের প্রিয় খেলা। যত বয়স বাড়ছে, এটা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদিত্যর মধ্যে কি কোনও চোরাগোপ্তা ফ্রাস্ট্রেশন আছে? আদিত্য কি দিন-দিন স্যাডিস্ট হয়ে উঠছে? আজকাল নিজের মতো করে শর্মিলা কিছুই ভেবে উঠতে পারে না। সারাক্ষণ আদিত্যর ডিরেকশনে চলতে-চলতে সে কেমন জুথুথু হয়ে গেছে।

শর্মিলার চোখে আবার জল চলে এল। এসেই সেঁ করে শুধে গেল কোথায়! সে বলল, "আজকাল না আপনাকে আমার ভীষণ রুড লাগে অ্যাট টাইমস। একটা সামান্য ইচ্ছেকে আপনি কত ব্যঙ্গ করে দেখলেন।"

বিয়ে এবং প্রেমপর্ব মিলিয়ে-মিশিয়ে আদিত্যকে শর্মিলা প্রায় দশ বছর চেনে। আজকাল আদিত্যকে অনেকে অপছন্দই করছে। বিশেষত দেবাংশুমা। সেই অপছন্দের জন্যই কি তলে-তলে দু'জনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে কোনও শত্রুতা? নইলে দেশোত্তমের বউ পরিজা কেন আদিত্যর সিঙ্গাপুর যাওয়ার কথাটা তার কানে তুলবে? চায়ের কাপে মুখ ডুবিয়ে শর্মিলা গোপনে একটু দেখল আদিত্যকে। শত্রুতার কথা, বন্ধুত্বর কথা তুললে আদিত্য বাঁকা হেসে বললে, 'আমার কোনওদিনও কেউ বন্ধু ছিল না। আমিও কোনওদিন কাউকে বন্ধু বলে ভাবিনি। আমি মনে করি যে, কেউ যখন-তখন আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে পারবে! আর আমি তার জন্য তৈরি। যতক্ষণ তুমি তোমার নিজের প্রয়োজনের সব কিছুকে কন্ট্রোল করতে পারছ, ততক্ষণ তুমি সেফ। ছেড়েছ কি মরেছ!'

মনে-মনে শর্মিলা ভাবল, ভুবনেশ্বর যাচ্ছি বলে আপনি সিঙ্গাপুর কী করে চলে গেলেন আদিত্য? আমাকে মিথ্যে ব্রেকফাস্টটা বানাও, চা তো বানিয়েই যাচ্ছি রোজ, এর পর কি ব্রেকফাস্টও বানিয়ে যেতে হবে?"

শর্মিলা বিছানা থেকে নেমে হাউজকোটটা গায়ে জড়াতে-জড়াতে বলল, "ভোরে চা তুমি নিজেই বানিয়ে খাবে বলেছিলে। এতে আমার দোষ কী হল?"

আদিত্য বলল, "লোকে ভাবে, এই আধবুড়ো লোকটা এমন একটা ততরুণ যুবতী মেয়ের কতই না সেবা পাচ্ছে! লোকে তো জানে না, আমার বউ কোনও কাজই করতে পারে না। উল্টে আমাকেই তার সেবা করতে হয়!"

এই 'আমার বউ' কথাটা আদিত্য আজকাল খুব বেশি বলে তার সামনে। তাকেই যেন শোনায়। তার ছ' বছরের বিবাহিত জীবনটা কি আস্তে-আস্তে ডুবন্ত জাহাজের মতো এক পাশে কাত হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে জলে? শর্মিলার হঠাৎ ভয় করে! বেডরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজে পা দিতে-দিতে শর্মিলা আদিত্যর উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, "মুন্সিদের কোম্পানি আমি এবার ছেড়ে দেব আদিত্য। অনেকদিন পর আমার সঙ্গে কেটিদির দেখা হল সেদিন, একটা এয়ারলাইন্স-এর পার্টিতে। কেটিদি বলল, 'মুন্সিরা লালবাতি জ্বালল বলে, তুমি যত তাড়াতাড়ি পার মুক্ত করো। 'ক্যাটাউন' জয়েন করছ না কেন?' আমার মনে হয়, কেটিদির অফারটা আমার ভেবে দেখা দরকার।"

আদিত্য কী বলছে শোনার জন্য সে আর দাঁড়াল না। নিজের পার্সোনাল ব্যবহারের টয়লেটে ঢুকে গেল।

আদিত্যর অনেক ব্যাপার আছে। সকালে উঠে স্নান করে বৌত, শুদ্ধ হয়ে তবে শর্মিলাকে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে হয়। ফলে উইক ডে-তে সে কোনওদিনই খুব সময় নিয়ে স্নান করতে পারে না। তারই মধ্যে আজ খুব দামি একটা শাওয়ার জেল দিয়ে শরীর পরিষ্কার আর পেলব করে তুলতে-তুলতে হঠাৎ শর্মিলা ভাবল, যে জীবনযাপনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, সেটা তার নিজের পক্ষে কোনওদিন অ্যাফোর্ড করা সম্ভব নয়। কোনও কারণে তাকে যদি আবার অনাদি ঘোষাল স্ট্রিট বা সমতুল্য জীবনে ফিরতে হয়, তা হলে সে মরে যাবে। একথা ভেবেই কেমন শিউরে উঠল শর্মিলা। পরেশ বলছিল, আগামী রবিবার মহুলের জন্য মেয়ে দেখতে গাড়ি নিয়ে সিউড়ি যাবে আদিত্য। পরেশের ধারণা, বউদির সঙ্গে যাবে দাদাবাবুর। পরেশ আদিত্যর খাস ড্রাইভার। মাসে-মাসে তারও উউটি করে পরেশ। পরেশের সঙ্গে এমনিতে দিব্যি

অন্যকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে পারলে আদিত্য আর কিছু চায় না। এটাই আদিত্য রায়ের প্রিয় খেলা।

প্রথম-প্রথম আদিত্যকে সে 'আপনি'ই বলত, ফর্মালি! কারণ, আদিত্য ছিল তার এমপ্লয়ার, কোম্পানির মালিক। আর সে ছিল এমপ্লয়ি। প্রেমের পরও বহু দিন 'আপনি' বলে এসেছে। তারপর বিয়ে হল। কিন্তু 'আপনি' বলাটা শর্মিলা পুরোপুরি ছাড়তে পারল না। যখনই আদিত্যকে তার একটু দূরের লোক মনে হয়, সে অমনই 'আপনি' বলে ফ্যালে! আসলে শর্মিলা নিজেও হয়তো জানে না, তার মধ্যে 'আদিত্যর এমপ্লয়ি' এই ব্যাপারটা কোথাও রয়ে গেছে এখনও! আর আদিত্যও সাম হাউ এই 'আপনি' বলাটাকে বরাবরই খুব এনজয় করে এসেছে। তাকে শুধরে দেয়নি কখনও! আদিত্য তো সকলের উপর প্রভুত্ব করতেই চায়। বস্তুত আদিত্যর সঙ্গে সকলের সম্পর্কই ওই গোছের। এমনকী, ওর বন্ধুদের সঙ্গেও একটা প্রভু টাইপের আচরণ করে থাকে ও! সেই জন্য বললেন? আপনি কি একাই গিয়েছিলেন? আপনি কি তা হলে পরমাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুর ঘুরে এলেন? এটা কী করে জানা যায়? কী করে? কিছু একটা করে? কিন্তু শর্মিলা দেখল, সে আর তেমন মাথা ঘাটাতে পারে না আজকাল। হঠাৎ শর্মিলার মনে হল, সে আসলে কোনওদিনই খুব বুদ্ধিদীপ্ত, চৌখস মেয়ে ছিল না। অঙ্কও সে প্রাণভরে মুখস্থ করত। রেন ব্যাপারটা তেমন ছিল কি না সন্দেহ। এত ভাল রেজাল্ট বলে সকলেই ভাবল, সে দুর্দান্ত ছাত্রী। সে নিজেও তাই ভাবল। একটা দারুণ সরকারি চাকরি পেয়েছিল সে রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে। নিল না, কারণ, আদিত্যর অফিস ছেড়ে যাওয়ার কথা তখন আর শর্মিলা ভাবতেই পারছে না। সেই বোকামিটার কোনও তুলনা হয়? তার অভিযোগটাকে পাত্তাই দিল না আদিত্য, "নাও, নাও, অনেক ঠোঁট ফুলিয়েছ। এবার ওঠো, বিছানা ছাড়ো,

খোলামেলা কথাবার্তা হয় শর্মিলার। গাড়িতে যেতে-আসতে সে পরেশের সঙ্গে আন্তরিক কথাবার্তা বলে-বলে অনেক ভাব জমিয়ে ফেলেছে। পরেশ এখন তাকে অনেক গোপন কথাও বলে! কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও পরমাকেই 'বউদি' বলে ডাকে পরেশ! আর তাকে বলে 'ম্যাডাম', স্রেফ 'ম্যাডাম!' অথচ পরেশের কাছেই শুনেছে যে, ছোট থেকে ড্রাইভারি করতে এবাড়িতে ঢুকে পরমার কাছ থেকে কোনওদিন স্নেহপূর্ণ আচরণ পায়নি ছেলেটা। আর শর্মিলা? পরেশকে কত না আপনার জন ভাবে। হয়তো সেটা তার অনাদি ঘোষাল স্ট্রিটের ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্যই হবে। তবু পরেশ কিন্তু তাকে কখনও বউদি বলে ডাকল না! কত যে ছোট-ছোট আক্ষেপ শর্মিলার! ছোট? নাকি জমিয়ে রেখেছে বলে? নইলে কীসের 'বউদি' পরমা এখনও? বউ তো সে! সে! পরমা তো প্রাক্তন!

ধুস! এই নাকি প্রাক্তন? নাকের ডগায় বসে আছে আদিত্যর! আহা, কী ভাল ডিভোর্সই না হয়েছে আদিত্য আর পরমার! ডিভোর্স হয়ে গেছে, কিন্তু পরমা শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে ছেলে নিয়ে থেকে গেছে আদিত্যর সল্টলেকের পৈতৃক বাড়িতেই! শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে সে যেমন পুতবধূ, তেমনই রয়ে গেছে, পরম আদরণীয়। আর আদিত্য বেরিয়ে এসে বিয়ে করে ফ্ল্যাট কিনে তাকে নিয়ে থাকছে। অথচ সকাল-বিকেল তার সল্টলেকের বাড়িতে যাওয়া চাই।

দুপুরবেলা সেক্টর ফাইভের অফিস থেকে আদিত্য মা'র হাতে তৈরি লাঞ্চ খেতে সল্টলেক যায়। ওখানেই এক ঘন্টার একটা ঘুম লাগায়। সম্ভবেলাও আত্মীয়পরিজন, ছেলে ইত্যাদি কারণে সল্টলেকের বাড়িতেই যায় চা খেতে। শর্মিলা অফিস থেকে ফেরে প্রায় সাড়ে ছ'টা-সাতটা। আদিত্য ফেরে আটটা। তাও মাঝে-মধ্যে ছেলেকে সঙ্গ দিতে বাইরে কোথাও ডিনারে যায় আদিত্য ছেলেকে নিয়ে। পরেশের ইঙ্গিতটা ধরলে তখন পরমাও যায় না যে, তা নয়!

যতক্ষণ না আদিত্য বাড়ি ফেরে, বাইপাসের এই হাই রাইজের ২৮ তলায় প্রায়ান্ধকারে শর্মিলা চুপ করে বসে থাকে। আগে যখন সে এসব নিয়ে আপত্তি করেছে, কান্নাকাটি করেছে, ঝগড়া করেছে, তখন আদিত্যর আচরণের মধ্যে থেকে একটা বাঁটাই বেরিয়ে এসেছে শুধু, 'সয়ে যাবে! সময়ে সয়ে যাবে!' এখন আর দুপুরবেলা অফিসে বসে কাজ করতে-করতে তার শরীর জ্বালা করে ওঠে না এই ভেবে যে, এই দুপুরে আদিত্য বাবা, মা, বউ, ছেলে নিয়ে এক টেবিলে বসে লাঞ্চ খেতে-খেতে হাসিঠাট্টা করছে। কিংবা রেস্ট নিতে যে ঘরে ঢুকছে সেখানে পরমা! নাঃ, সে আর এসব ভাবে না। এটা একটা ব্যবস্থা, যা সে মেনেই নিয়েছে বলতে গেলে। তাই বলে আদিত্য পরমাকেই নিয়ে সিঙ্গাপুর বেড়াতে যাবে তাকে লুকিয়ে? উফ! সেদিন পরিজ কি রকম ফিচেল হেসে বলল, 'আদিত্যদার তো প্রেমিক হল বউ আর বউ হল প্রেমিকা!' বলেই চোখ মেরেছিল তাকে। আর সে যেন কিছুই বুঝতে পারেনি, এমন ভাবে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল ওয়াইন ধরা গ্লাস হাতে। আর তার মনে হয়েছিল, আমার কী? পরিজা তো আমাকে কিছু বলছে না, বলছে আদিত্যকে। বলছে, বেশ করছে!

রেকফাস্ট টেবিলে দ্রুত খাবার খেতে-খেতে আদিত্য বলল, "আমি সাড়ে আটটার মধ্যে ফিরে যাব, তারপর মহেন্দ্র মোটরস-এর একটা পার্টিতে যেতে হবে। তুমি রেডি হয়ে থেকো!"

শর্মিলা ভাবল, এখন থেকে সাড়ে আটটা অবধি তা হলে আমি বুঝি স্বাধীন? হঠাৎ সে ঠিক করল, আজ দুপুর-দুপুর অফিস থেকে বেরিয়ে সে যদি একবার অনাদি ঘোষাল স্ট্রিটে যায়, কেমন হয়? আদিত্যকে না জানিয়ে? ভাবতেই গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল তার। যেন একটা অ্যাডভেঞ্চার!

ঠিক দু'টোর সময় শর্মিলা মুন্সিজির ছোট্ট চেম্বারে ঢুকে বলল, "মুন্সিজি, আমি একটু বাপের বাড়ি যাব আজ। আজ আর অফিসে ফিরতে পারব না। কেয়াকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি, ও সামলে নেবে।"

মুন্সিজি মাথা নাড়তে সে আর দাঁড়াল না। রাসেল স্ট্রিটের ছোট্ট অফিসটা থেকে বেরিয়ে সারি-সারি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোতে-এগোতে সে ভাবল, মোটে দেড়। মার্চ মাস অথচ রোদের তেমন তেজ নেই। হাঁটতে তার খারাপ লাগছিল না। ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে পরে নিল শর্মিলা। কিন্তু কিছুটা যেতে না-যেতেই আপন মনেই একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে সে বলল 'শ্যামবাজারে হেমন্ত সেতু!' গাঁক-গাঁক করে ছুটল ট্যাক্সি। তিন মাথার মোড়ে সে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। এক পা-এক পা করে খুব যত্ন সহকারে এগোল শর্মিলা। আর ঠিক তখনই তাকে পাশ কাটিয়ে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর এসে দাঁড়াল কানাই জেঠার বাড়ির সামনে। এখনও কিছু খই রাস্তায় ওড়াউড়ি করছে। শর্মিলা দেখল, গাড়ি থেকে খুব বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে নেমে আসছে সরসীদি, নীলাদি। সে থমকে দাঁড়াল, কে? কানাই জেঠা? না জেঠিমা? নিজেকেই প্রশ্ন করল শর্মিলা!

সে দেখল ধীমানলকে। ফোনে কাকে বলছে, "হ্যাঁ, বিরাট লাইন ছিল আজ, কাশী মিত্তির ঘাটে। আমরা এই পাড়ায় ফিরলাম!"

কানাই জেঠার রকের উপর একটা পিতলের রেকাবি হাতে দাঁড়িয়ে হৈমন্তী কাকিমা। পরনে একটা ন্যাতানো হলুদমাখা শাড়ি। ভাঙা-ভাঙা গলায় হৈমন্তী কাকিমা বলল, "সরসী, তোরা নিমপাতা মুখে ছুঁইয়ে ঘরে ঢোক। ও ধীমান, টেবিলে রসগোল্লার হাঁড়ি রাখা আছে, ছেলেগুলোকে বলো, মিষ্টি জল খেয়ে বাড়ি যেতে! আমাকেও এবার বাড়ি যেতে হবে।"

শর্মিলা ভাবল, সকালেই তার একবার কানাই জেঠার বথা মনে হয়েছিল না? আগে বাড়ির সদর দরজা সব সময় হাট করে খোলা থাকত। তখন বাড়িভর্তি লোক ছিল। অবিরত ঢোকা বেরোনো। এখন ছ' বছর পর বাই লেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শর্মিলা দেখল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। এবং দরজার পাশে তিনটে বেল। তিনটে বেল কেন?

কোনটা টেপে, কোনটা টেপে করে, যেটা একদম হাতের ময়লায় কালো হয়ে আছে সেটাতেই আঙুল ছোঁয়াল সে।

॥ ৩ ॥

একটা বাসন্তী রঙা কম দামি সুতির সালোয়ার-কামিজ-এর উপর নীল ওড়না জড়িয়ে যে ২০-২১ বছরের মেয়েটা দরজা খুলে দিল শর্মিলাকে, তার বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তাকে চিনে নিতে! জামাটা কম দামি হলে কি হবে, খুব যত্ন করে কেচে পরা। ধোওয়া চুল পিঠের উপর ছড়ানো। পিছনে ক্লিপ আটকানো। এই ক্লিপগুলো হাতিবাগান মার্কেটের ফুটপাতে থরে-থরে বিক্রি হয়, এইটুকু লক্ষ করতে না-করতেই মেয়েটা বলে উঠল, "ভানুদি? তুমি? কত দিন পর এলে! ভানুদি এসেছে মা!"

দোতলার টানা বারান্দায় গায়ত্রীকে দেখা গেল, "কে? ও মা, ভানু তুই? আমি ভাবছি, এই ভরদুপুরে কে এল?"

সানগ্লাস ব্যাগে ঢোকাতে-ঢোকাতে শর্মিলা ঢুকে এল সদর পার করে বাড়ির মধ্যবর্তী চাতালে। দুপুরের এই সময় চাতালের উপর এসে পড়া রোদের রং আর রেখা

অপরিবর্তিত। একতলাটা নতুন চুনকাম করা হয়েছে। জানলা দরজাতেও লাগানো হয়েছে বটল-গ্রিন তেলরং। অবশ্য একতলার সব ঘরের দরজায় ঝুলছে তালা। ঢুকে এসে শর্মিলা বলল, "আমি তো ডালিয়াকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারিনি মামি! ভেবেছি, নতুন ভাড়াটে-টাড়াটে এসেছে হয়তো!" যতটা উচ্ছ্বাস সে ফোটাতে চাইল গলায়, ততটা ফুটল না। সে নিজেও ঠিক জানে না, আজ অনাদি ঘোষাল স্ট্রিটে ছ' বছর পর সে কেন এসেছে!

গায়ত্রী উপর থেকে বলল, "আয়, আয় ভানু, তা তোর মুখটা এমন লাগছে কেন রে? রোদ লাগল কী করে? গাড়ি চড়ে আসিসনি? তোর বর তোকে ছাড়ল? বাবাঃ! এলি তা হলে? মনে পড়ল আমাদের?"

সে বুঝতে পারল, সিঁড়ি দিয়ে তার পিছন-পিছন উঠে আসতে-আসতে ডালিয়া তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। তার হাইট বেশ ভাল, পাঁচ পাঁচ। তার উপর পেনসিল হিল পরেছে। ছ' বছর পর এই বাড়িতে ঢুকে তার মনে হচ্ছে, বাড়িটা কি ছোট, ঠাসা-ঠাসা ঘর, মাত্র এক কাঠা ছ' ছটাক জমির উপর কী করে এতগুলো ঘর, রোয়াক, চাতাল, কলতলা, রান্নাঘর, সিঁড়ি সব বেরল? আগে যখন এবাড়িতে সে থাকত, তখন এই প্রশ্ন তার কখনও মনে আসেনি। এখন আসাটা স্বাভাবিক। কারণ, এখন সে সারাক্ষণ জমি, বাড়ি, প্রপার্টি সংক্রান্ত নানা আলোচনা শুনছে। আদিত্যকে এটা কিনতে, ওটা বিক্রি করতে দেখছে। তা ছাড়া 'ইস্ট সিটি'তে তাদের বাসস্থানই তো প্রায় তিন হাজার স্কোয়্যার ফুটের। ২৮ তলার উপর একটা খোলা ছাদও আছে, যেখানে অনায়াসে ২০-২৫ জনের জন্য একটা পার্টি থ্রো করা যায়! সত্যি, এত বড় বাড়িতে সে এখন থাকে, কিন্তু বাড়িটার একটা ছোট্ট কোণও কখনও তার একাকিত্বের আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে না! এত বড় বাড়ি, অথচ লুকোনোর একটা অন্ধকার স্থান নেই। আর এবাড়িতে কত যে গোপন জায়গা ছিল! চোখের জল ফেলার, রাগ করে সকলের চোখের আড়ালে থাকার, চুপচাপ বসে মোটা-মোটা বই সারা বেলা ধরে পড়ে ফেলার কত ছোট-ছোট অমোঘ সব ঠাঁই, যেখানে আত্মলীন হয়ে যাওয়া যেত! শর্মিলা ভাবল, তখন তো অনেক কিছুই মনে হত বড় কষ্টের, বড় দুর্ভোগের। আজ এত বছর পর একটা কমফর্টেবল লাইফে থেকেও, এত আরাম-ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও তার কেন যে অনাদি ঘোষাল স্ট্রিটের স্মৃতিকে, সমস্ত স্মৃতিকে বড় প্রিয়, বড় মধুর লাগে, কে জানে!

এত কাল পরে আসা হল, প্রথম মিনিটপনেরো কে কী বলছে, কোনও ঠিক রইল না। গায়ত্রী গায়ত্রীর মতো বলে যাচ্ছে, শর্মিলা শর্মিলার মতো বলে যাচ্ছে, ডালিয়াও প্রশ্ন করছে! তিনজনই একটু হাঁপিয়ে গিয়ে বসল দোতলার ডালিয়ার ঘরে। ছোট মামা অফিসে, ফিরতে বিকেল।

গায়ত্রী বলল, "ও ভানু, তুই দুটো ভাত খা? দুপুরে এলি যখন? গরিব মামার বাড়িতে শুধু ভাত, ডাল চচ্চড়ি, খাবি?"

শর্মিলা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, "মামি, তুমি আর গরিব সেজো না। আজকাল সরকারি চাকরির মাইনে অনেক। তার উপর মামা তো কত বছর চাকরি করছে!"

গায়ত্রী ফিক করে হেসে বলল, "তোর মামাকে বুড়ো বললে রেগে যায়! তা ও বুড়ো নয়, বল?"

সে বলল, "তুমি কিন্তু একদম ইয়ং আছ। ফিগার সেই আগের মতো, পান খাওয়াটা ছাড়োনি এখনও মামি?"

ডালিয়া বলল, "ভানুদি, তুমি এখন আরও সুন্দরী হয়েছ। কী দারুণ দেখাচ্ছে তোমায়!"

শর্মিলা ঘুরে বসল ডালিয়ার দিকে, "দাঁড়া, দাঁড়া, তোকে আগে দেখি! বাবা, এ তো বিউটি কুইন! পাড়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে নাকি? মামার চোখে ঘুম নেই?"

মামি বলল, "ও ভানু শোন, এবার দুর্গাপুজোয় ডালিয়া তো লাল পাড় শাড়ি-টাড়ি পরে অঞ্জলি দিতে গেছে। আর কারা সব এসেছিল টুরিস্ট, তারা ডালিয়াকে পাঁড় করিয়ে একের পর এক ছবি তুলছে! আয়েষার বড় মেয়েটাকে সবাই বলে অপূর্ব সুন্দরী। তার ছবি কেউ তোলেনি। তাই আয়েষা তো রেগে কাঁই! তুই তো জানিস, আয়েষার কি অহঙ্কার! তা তুমি বিশ্বম্ভর ঘোষের ছেলের বউ সে পাড়ায়, বেপাড়ার লোক তোমায় পাত্তা দেবে কেন, তারা জাপানি টুরিস্ট বুঝলি..."

"আঃ মা, চুপ করো তো!" বলে উঠল ডালিয়া।

সে বলল, "আয়েষা তো আমার চেয়ে অনেক বড় মামি। সাত-আট বছরের বড়।"

"হ্যাঁ, অভীক আর আয়েষা তো একই বয়সি, না? তোর আর অভীকের ম্যাচটাই বেশি ভাল ছিল। বাবা, আয়েষা কি বউই না হয়েছে, সারাদিন পাড়া বেড়াচ্ছে, বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে গল্প করছে। অত বড় বাড়ির বউ, ম্যাক্সি পরে রাস্তায় বেরয়। সে বেলা কিন্তু কেউ কিছু বলে না। অন্য বউরা কেউ কিছু করুক, সকলে অমনই সমালোচনা করা শুরু করে দেবে! হ্যাঁ রে ভানু, তোর বরের তো কতগুলো গাড়ি, একটা বেশ বড় গাড়ি চড়ে এসেছিস তো?"

সে বলল, "না মামি। আদিত্যকে না বলে এসেছি, মনটা খুব টানছিল। পাড়ার মোড়ে এসে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলাম। আজ ভোরে স্বপ্ন দেখলাম, তুমি নিম-বেগুন ভাজা করেছ আর আমাকে কুণ্ডুদের পাঁচিলের এপাশ থেকে ডাকছ ভাত খাওয়ার জন্য!"

নর্থ ক্যালকাটার সব যদি অতই খারাপ, তা হলে সে তো নর্থের মেয়ে, তাকে আদিত্যর পছন্দ হল কেন?

"তুই থাম, বলতে দে।"

শর্মিলা দেখল, তার শরীরটা বেশ গরম হয়ে উঠছে। চনমন-চনমন করে উঠছে মনটা। আঃ, পাড়াটা ছ' বছরে কিছুই বদলায়নি। বদলালে সে বেশ দুঃখ পেত। এসব কাসুন্দির স্বাদ সে কত দিন পায়নি! তার মনে হচ্ছে, মামি আরও বলুক এসব, এপাড়ার হাল-হকিকত। তার কথা কেউ বলে? বলে না?

সে বলল, "ও, আয়েষার বড় মেয়েটা বুঝি খুব সুন্দরী? কত বয়স হল গো?"

মামি বলল, "ডালিয়ার চেয়ে ছোট, ১৮-১৯ হবে। সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু স্বিনটা ভাল না। মুখে ব্রণ হয় খুব, আয়েষার মতো রূপ পায়নি। আয়েষা তো রূপের জোরে তরে গেল বল?"

ডালিয়া বলল, "আয়েষাদিকে দেখলে তুমি চিনতেই পারবে না। মাড়োয়ারি বউদের মতো মোটা। থপথপ করে হাঁটে!"

"তুই কিন্তু একদম মোটা হোসনি ভানু!"

"মাছ না, মাংস না, নিম-বেগুন ভাজা? আশ্চর্য! আজ নিম-বেগুন তো ভেজেছি। চল, খাবি চল।"

"তোমরা এখনও খাওনি?"

"না, এবার বসব। 'ভাইবোন' সিরিয়ালটা দেখেই বসতাম, আয়।"

"না, না, মামি, আমি খাব না। আমি লাঞ্চ করে বেরিয়েছি।"

"আবার কথা বলে!"

"ভানুদি, তুমি না খেলে আমি খাবই না!"

ডালিয়ার মধ্যে সেই নেতিপেতি ভাবটা এখনও রয়ে গেছে। এই বোনটাকে সে খুবই ভালবাসত। শর্মিলা ভাবল, এত বছর ধরে আদিত্যর বাধাদানের ফলে এবাড়িতে যাতায়াতটা বন্ধ করে সে অন্যায়ই করেছে, ভুলই করেছে। কই আদিত্য তো নিজের কোনও কিছু বন্ধ করেনি? বাড়ি, বাবা-মা, আত্মীয়পরিজন, মায় প্রাক্তন স্ত্রী, সকলের সঙ্গেই লোকটার অবারিত যোগাযোগ। আর তার বেলা যত শাসন! হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, ছোট মামা আদিত্যর সঙ্গে তার বিয়েটা মেনে নেননি। সে প্রায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েই বিয়েটা করেছিল এবং বিয়ে করে আদিত্যকে নিয়ে সে প্রণাম করতে এলে ছোটমামা প্রণাম গ্রহণ করেনি, তেমন কথাও বলেনি। তাই আদিত্যর রাগ থাকতেই পারে। কিন্তু সে তো আদিত্যর বাবা-মাও তাকে সেভাবে মেনে নেননি। তা বলে কি সে আদিত্যকে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাধা দিচ্ছে? আর নর্থ ক্যালকাটার সব কিছু যদি অতই খারাপ, আদিত্যর ভাষায়, 'ঝুরঝুরে ড্যাম্প লাগা তোষকের মতো' হয়ে থাকে, তা হলে সে-ও তো নর্থের মেয়ে, তাকে আদিত্যর এত পছন্দ হল কেন?

ডালিয়া যে ছোটবেলায় তার খুব হাতধরা ছিল, তা নয়। ১৫ বছরের ছোট বোন, কলেজে পরা দিদির সঙ্গে একটা দূরত্ব তো থাকেই। তারপর চাকরিতে ঢোকার পর শর্মিলা তো বাড়ির বাইরেই থাকত গোটা দিন। আদিত্যর সঙ্গে প্রেম পর্বে তো রাতে এসে শোওয়াটুকু এবং বাইরেই খেয়ে আসত। ফলে ডালিয়ার ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা তার নজর এররকম এড়িয়েই গেছে। তবে ডালিয়া খুব শান্তশিষ্ট ছিল, মনে পড়ে শর্মিলার। আজ ডালিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তার নস্তুন করে মায়া জন্মাল যেন! শর্মিলার তো কোনও বন্ধু নেই। ডালিয়া হোক ছোট, তবু বোন তো। তাই ডালিয়া তার বন্ধুও তো হতে পারে, সে ভাবল। এবার আদিত্য টুরে গেলে সে ডালিয়াকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, শপিং করাবে, বড় রেস্তরাঁয় খাবে। এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তাকে আনন্দ দিল এখনই।

এমন স্পষ্ট আনন্দ সে অনেক দিন অনুভব করেনি! সে সেই আতিশয্যে বোনকে তিরস্কারও করল একটু, "ওঃ, এখন দরদ উথলে পড়ছে দিদির উপরে? কই একবার তো একটা ফোনও করিস না দিদিকে?"

ডালিয়া বলল, "বাবা তো দেয় না করতে! জানোই তো বাবা কেমন!"

"তুই পার্ক স্ট্রিটের দিকে যাস না কখনও? আমার অফিসে আসতে পারিস তো?"

"পার্ক স্ট্রিট! আমি জীবনে দু'বার গেছি! বাবা নিয়ে গেছিল, পাঁচশে ডিসেম্বর।"

"পঁচিশে ডিসেম্বর যাবি না। যাবি ক্রিসমাস ইভে, চব্বিশের সন্ধেবেলা, তা হলে অনেক কিছু দেখতে পাবি।"

"তাই?"

গায়ত্রী বলল, "তুই কেন এখনও তেতেপুড়ে চাকরিটা করছিস ভানু? তোর কি টাকার অভাব? কোথায় পায়ের উপর পা তুলে খাবি আর দামি-দামি শাড়ি-গয়না কিনবি, তা না, রোজ অফিসে যাওয়ার

ঝঞ্জাট পোহাচ্ছিস!"
সে বলল, "বাড়িতে বসে থাকার কথা আমি তো ভাবতেই পারি না মামি! সে এক যদি খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত, সংসারে ঢুকে যেতাম, তা হলে হত। একবার বাইরের জগৎটা দেখে নিয়ে আর সম্ভব নয়।"
মনে-মনে একথা বলে শর্মিলা হাসল। হ্যাঃ! কী বাইরের জগৎই না দেখছে। ওই অফিসে আসে-যায় সেজেগুজে, ওই পর্যন্তই। সবটাই তো আদিত্যর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চাকরি তো আদিত্যই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বন্ধুর কোম্পানিতে। কারণ, বিয়ের পর তাকে আর নিজের কোম্পানিতে রাখতে চায়নি।
হঠাৎ মামি বলল, "তা তুই একটা বাচ্চা-টাচ্চা নিলি না? তোর তো সন্তান-সুখ হল না, ওঁর না হয় ছেলে আছে।"
সে বলল, "ছাড়ো, চলো, দুটো ভাত খাই তোমার সঙ্গে।"

করতে খরচ হয়েছে। মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি, টাকা নিয়ে মামা করছেটা কী? শেষ পর্যন্ত শর্মিলা গায়ত্রীর ঘরের মেঝেতেই আসন পেতে বসল খেতে। তিনজনের কথাবার্তার কোনও বিরতি নেই। মোটা ভারী স্টিলের থালায়, স্টিলের গ্লাসে খেতে দিয়েছে গায়ত্রী তাকে। শর্মিলার সংসারে ছুরি, কাঁটা-চামচ ছাড়া স্টিলের কোনও বাসন নেই। অবশ্য আদপেই যদি ওটাকে কোনও সংসার বলা চলে।
নিম-বেগুন পাতে পড়তেই শর্মিলার মনটা ভারী হয়ে গেল খুব। সে বলল, "আমার কি কানাই জেঠার বাড়ি একবার যাওয়া উচিত জেঠিমার সঙ্গে দেখা করতে? এসেই পড়েছি যখন?"
হাতা রয়েছে ভালে, মাছের ঝোলের বাটিতে। গায়ত্রী ভাত তুলে দিচ্ছে হাতে করে, লাউ-চিংড়ি দিল হাতে করে! শর্মিলার একটু ঘেন্না-ঘেন্না করল,

তার কাছে অতি স্বাভাবিক ছিল। নিম-বেগুন খেতে তার বেশ লাগল। কিন্তু কাঁসার পাত্রে রাখা মুগের ডালে সে যেন কেমন ধাতু-ধাতু গন্ধ পেল। তবু তার সম্যক টান কম হল না। সে গল্প করতে-করতে খেতে লাগল, "ঠিক সাড়ে চারটের সময় বেরিয়ে যাব মামি, গাড়ি আসবে অফিসে ছ'টার মধ্যে।"
গায়ত্রী বলল, "মাঝে-মাঝে এরকম চলে আসিস। আর যাওয়ার সময় চাইলে যেতে পারিস কানাইদার বাড়িতে।"
এই সময় ডালিয়ার ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরে ডালিয়া বলল, "হ্যাঁ যাচ্ছি। খেয়ে যাচ্ছি। আসলে ভানুদি এসেছে তো, খুব গল্প হচ্ছে!"
সে বলল, "কে রে? কোথায় যাবি?"
ডালিয়া বলল, "আয়েয়াদির বাড়ি। আয়েয়াদির বড় মেয়ের পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে এখন করার কিছু নেই। আমরা দু'জনে দুপুরে বসে গল্প করি, ফেসবুক করি, সিনেমা দেখি, গান শুনি...ছোট মেয়েটাও আসে মাঝে-মাঝে। আর্যদির মেয়ে রুমনিও আসে। খুব মজা হয়। আমি একটু বড় ওদের চেয়ে, কিন্তু আমার ভালই লাগে। আমিই বা আর কী করব বল ভানুদি? কলেজের বান্ধবীরা কেউ কাছে থাকে না। হয় সিঁথির মোড় না হয় হেদুয়া। বাবা কোথাও যেতে দেবে না। এপাড়ায় এখন আমার বয়সি মেয়ে প্রায় নেই বললেই চলে।"
"তুই এম এ-টা করলি না কেন?" বলল শর্মিলা।
"বাবা তো গত বছর থেকেই বিয়ে দেবে বলে উঠেপড়ে লেগেছে! বলে দিয়েছে, এখন আর বাড়ির বাইরে যেতে হবে না। বিয়ে করে মাস্টার ডিগ্রি কোরো, যা খুশি কোরো! কি পাগল, বলো?"
"ওমা, তোর মতো অঙ্গরা, তোর তো পাত্রের লাইন পড়ে যাওয়ার কথা!" গত বছর থেকে পাত্র খোঁজা চলছে আর এখনও পাত্র জোটেনি শুনে সত্যিই অবাক হল শর্মিলা। ডালিয়াকে সত্যিই বড় সুন্দর দেখতে, শুধু ভুরু জোড়া একটু বেশি ঘন। আর ঠোঁটের উপর হালকা একটু রোমের আভাস আছে। আর এই দু'টো ফিচারই ডালিয়াকে র‍্যাম্প সুন্দরী, বিজ্ঞাপনের সুন্দরীদের চেয়ে একেবারে আলাদা একটা মাধুর্য দিয়েছে। একেবারে পুরনো ধাঁচের, একালে অমিল, একটা কমনীয়তা, এত রোগা অথচ হাত-পায়ের কী সুন্দর গড়ন! নিটোল, যেন হেমেন মজুমদারের নারী। এ মেয়ে দৌড়ঝাঁপ করে চাকরিবাকরি করবে বলে মনে হয় না। বিয়ে করবে, মেনেই নিয়েছে। তা হলে ডালিয়ার উচিত খুব বড়

আরামপ্রদ জীবনের কী অনুষঙ্গ, তা নিয়ে উত্তরের লোকেরা আজও বড় বেশিই উদাসীন।

দোতলার রান্নাঘরটা খুব বড়। রান্নাঘরেরই এক কোণে খাবার টেবল পাতা আছে। টেবিলও সেরকমই টেবল! অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়ে উপরটা মোড়া।
গায়ত্রী বলল, "এখানে তোর খুব গরম লাগবে ভানু। বরং আমার ঘরের মেঝেতে বসে খাবি? আমার ঘরে নতুন ফ্যান লাগানো হয়েছে। হাওয়াটাও বড় মিষ্টি!"
মেঝেতে বসে খাওয়া অসম্ভব! পেট চেপে বসতে হলে সে মরে যাবে। আবার এখানে রান্নাঘরের গরম, শর্মিলা দু' সেকেন্ডের জন্য মহা ধন্দে পড়ল। আর সত্যি নর্থের লোকেরা বড় কিপটে হয়! জীবনযাপনের ধরনধারণের মধ্যে কোনও শ্রী নেই। আরামপ্রদ জীবনের কী অনুষঙ্গ, তা নিয়ে উত্তরের লোকেরা আজও বড় উদাসীন। নইলে ছোট মামা এই রান্নাঘরটা একটু সারাতে পারে না? একটা ডাইনিং টেবল কিনতে পারে না, একটা ফ্যান সেখানে দিতে পারে না? বাড়িঘর করতে হয়নি। ছেলে নেই যে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার

মেঝেতে বসে খাওয়া, খাটের তলায় ঝুল রয়েছে দেখা যাচ্ছে, একটা দুটো চুল উড়ছে মাটিতে, সে চোখ সরিয়ে নিতে-নিতে ভাবল, নর্থের লোকেরা কখনও বদলায় না। গায়ত্রী তাকে যা ভাত দিয়েছে, সে সারা সপ্তাহে অত ভাত খায় না! সে বারবার অনুনয় করল ভাত তুলে নিতে, লাগলে পরে নেবে। গায়ত্রী আর ডালিয়ার থালাতেও পাহাড়প্রমাণ ভাত, এত ভাত খেয়েও গায়ত্রী বা ডালিয়ার শরীরে কোনও মেদ নেই! আর সে তিনটে দিন যদি একটু রুটিনের বাইরে গিয়ে খায়, তার গাল নাকি টোপা-টোপা হয়ে যায়, তলপেটে ঝুলে আসে, অবশ্য আদিত্যর উক্তি অনুযায়ী! গায়ত্রীকে ভীষণ হিংসে হল শর্মিলার এই একটা ব্যাপারে। কত ভাত খাচ্ছে গায়ত্রী সপসপ করে গ্রাস তুলে। গায়ত্রীর রান্না বরাবরই খুব ভাল। কিন্তু সেই সকালে রান্না হয়েছে, খেতে বসার আগে সেগুলো নতুন করে গরমও করেনি। শর্মিলার মনে পড়ল, এসব আগে

বনেদি বাড়িতে বিয়ে হওয়া। কেজো বাড়িতে ওকে মোটেও মানাবে না। খাওয়াদাওয়ার পর শর্মিলা একতলার কলতলায় গেল আঁচাতে। গায়ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, ছোট মামা এখন একতলাটা সারিয়ে-সুরিয়ে রেখেছে ভাড়া দেবে বলে। কিন্তু মনমতো ভাড়াটে পাচ্ছে না। ডালিয়া বড় হওয়ার পর মামা আর অল্পবয়সি ছেলে আছে, এরকম পরিবারকে বাড়ি ভাড়া দেবে না ঠিক করেছে। মামির ধারণা, ডালিয়ার বিয়ে না মিটলে একতলাটা খালিই থাকবে।

"তোর মামার যতসব!" বলে গায়ত্রী মুখ মটকে হাসল, এই বয়সেও গায়ত্রী চোখে কাজল দেয়। পান খেয়ে তাকে বেশ লাস্যময়ী লাগে।

একতলার বড় ঘরে থাকত দাদু, আমৃত্যু। আর তার পাশের খুব ছোট ঘরটা ছিল শর্মিলার, বাবা-মা'র খাট, একটা আলমারি রাখার পর পড়ার টেবিল ঢুকত না। সারা জীবন সে দাদুর ঘরেই বসে পড়াশোনা করেছে। বুড়ো হতে-হতে দাদুর বড় বকবকানি ধরেছিল। খুব মুশকিল হত তখন শর্মিলার। অথচ চামড়া দিয়ে বাঁধানো দাদুর টেবিল ছাড়া পড়ায় মনও বসত না তার। একটা সময় দাদু যখন আর বাইরে বেরতে পারত না, তখন কেউ বাইরে থেকে ঘুরে বেরিয়ে এলে, বিয়ে, পৈতে বাড়ি থেকে ফিরলে, ঠাকুর দেখে কিংবা ফাংশন শুনে এলে দাদু তাকে প্রশ্নে-প্রশ্নে জেরবার করে দিত! দাদুর প্রশ্ন করার ধরনটা ছিল ভারী অদ্ভুত।

'হ্যাঁ, তারপর তোমরা তো গেলে, যেতেই বেয়াইমশাই দরজা খুলে দিলেন?'

'না দাদু, গোপামাসি দরজা খুলে দিল।'

'ও, তা গোপা তো তোমাদের দেখে খুব খুশি হল? হয়ে বলল, তোমরা এত দেরি করে এলে কেন?'

'হ্যাঁ দাদু, তাই বলল।'

'ওদের কুকুরটা তো নিশ্চয়ই লাফালাফি শুরু করে দিল।'

'হ্যাঁ দাদু, খুব লাফাচ্ছিল।'

'বেশ! বসতে বলল কি একতলায়, নাকি উপরে নিয়ে গেল?'

'না, না, উপরেই নিয়ে গেল সোজা।'

'ও, তখন ওদের পুজো শুরু হয়ে গেছে? নাকি ঠাকুরমশাই এসেই পৌঁছয়নি?'

'দিব্যি ঠাকুরমশাই এসে গেছেন!'

'বেয়াইমশাই তো আবার শার্ট-প্যান্ট পরা সাহেব মানুষ, চুরুট খান, উনি নিশ্চয়ই পুজো দেখতে এলেন না, বসে-বসে টেলিভিশন দেখতে লাগলেন?'

'না, দাদুকে তো দেখলাম না একবার!'

'একবারও দেখলে না? সে কী? ছোট বউমাকে ডাক ভানু। তা হলে কি বেয়াইমশাই রাগ করে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বসে রইলেন?'

এই রকম আর কী! একবার বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গাপুজোয় নতুন ধরনের আলোর কারসাজি করেছিল। ঠাকুর দেখে ফিরে দাদুকে সেই আলোর খেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল শর্মিলার! আহা রে! ভাবল শর্মিলা, দাদুকে সে বড় ভালবাসত। যখন এবাড়িতে পা দিয়েছিল ঘণ্টাদেড়েক আগে, তখন একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব ছিল তার মধ্যে। এখন সেটা চলে গেছে। মনটা অনেক দ্রব হয়ে এসেছে। সে গায়ত্রীকে বলল, "দাদুর ঘরটা একবার দেখব মামি?"

"দ্যাখ না, কিন্তু বাবার পালঙ্ক-টালঙ্ক সব তো তিনতলায় তুলে দেওয়া হয়েছে।"

"ওঃ!" বলল সে।

আবার দোতলায় উঠতে হল তাকে। ব্যাগ থেকে ছোট আয়না আর লিপস্টিকটা বের করে মুখটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে শর্মিলা গায়ত্রীকে বলল, "এবার উঠি মামি," বলেই সে বলতে যাচ্ছিল 'তোমরা একদিন এসো,' কিন্তু কথাটা গিলে নিয়ে সে বলল, "ডালিয়া চল, একদিন তুই আর আমি কোথাও একটু ঘুরে আসব!"

ডালিয়া খুব মিষ্টি করে মাথা নাড়ল।

গায়ত্রী বলল, "আবার আসিস ভানু। তুই হয়তো ভাবিস, মামি ভুলেই গেছে, ডাকে না, পুজো-টুজো চলে যায়, একটা শাড়ি-টাড়িও দিই না তোকে। আসলে তোর বর আর তোর মামার মধ্যে আমরা পড়ে গেছি রে, দুঃখ হয়!"

সদর দরজা অবধি এসে মামি বলল, "ও ভানু! ভদ্রলোকের আগের স্ত্রী কি এখনও শ্বশুরবাড়িতেই থাকে?'

"হুঁ!"

"ভাল কথা নয় ভানু, ভাল কথা নয়। সাবধানে থাকিস, কবে আবার আমে-দুধে মিলে যাবে, আঁটি হয়ে গড়াগড়ি খাবি!"

ডালিয়া কিছুটা এল তার সঙ্গে। তারপর চলে গেল আয়েষাদের বাড়িতে। সে বিশ্বম্ভর ঘোষের বাড়ির পাশ দিয়ে কোনওমতেই যাবে না। সে আবার অনাদি ঘোষাল স্ট্রিট দিয়ে বটতলায় এসে ট্যাক্সি ধরল।

ট্যাক্সিতে বসে তার প্রথম যে কথাটা মনে হল, সেটা বড়ই অদ্ভুত! সে ভাবল, আচ্ছা, ডালিয়ার সঙ্গে যদি মহুলের বিয়ে দেওয়া যায় কেমন হয়? ধুস, কোনওদিন সম্ভব নয়। আদিত্যরা অসম্ভব নাক উঁচু, অহঙ্কারী, আর ওরা খুঁজছে বড় বাড়ির কনভেন্ট এডুকেটেড, চূড়ান্ত স্মার্ট মেয়ে। মহুল আবার তিন বছর লন্ডনে থেকে পড়াশোনা করে এসেছে। এদিক থেকেও সম্ভব নয়। ছোট মামা কোনওদিন ডালিয়ার বিয়ে সেই পরিবারে দেবে? মহুলের বাবা ছোট মামাকে কি কম অপমান করেছিল ফোনে সেই একদিন? যেদিন তাকে একবার আসতে বলেছিল ছোট মামা?

॥ ৪ ॥

সোহিনীর আজ সকাল থেকে মাথা গরম! তিনতলায় যে ঘরে সে থাকে, অর্থাৎ যে ঘরটা তার বেডরুম, তার পাশের ঘরটা বহুকাল ধরে গুদোম হয়ে ছিল। সংসারের

যাবতীয় অকাজের জিনিস কাস্তা সেখানে জমা করেছিলেন এত বছর ধরে। কাস্তা সম্পর্কে তার শাশুড়ি! তিনি থাকেন দোতলায়। রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া সব দোতলায় হয়। তিনতলার ওই গুদোম ঘরটাকে বউ হয়ে আসার পর থেকেই সোহিনী নিজস্ব একটা বসার ঘরের চেহারা দেওয়ার চেষ্টায় ছিল। প্রকৃতপক্ষে এত বড় বাড়ি হলে কী হবে, এবাড়িতে সে অর্থে কোনও ড্রইংরুম নেই। সোহিনীর বরাবরের শখ একটা সুন্দর করে সাজানো-গোছানো ড্রইংরুমের। এতদিন যারা ভাড়া থাকে, তারাই এবাড়ির বৈঠকখানার দখল নিয়ে রেখেছে।

নতুন বউ হয়ে আসার পরই সোহিনী বুঝেছিল, কমল সম্পূর্ণ মায়ের আঁচলের তলায় থাকা একটা গোবরগণেশ টাইপের ছেলে। এবাড়িতে সবই ঘটে কাস্তা বাঈ-এর কথায়! আড়ালে সোহিনী শাশুড়িকে 'কাস্তা বাঈ' বলে ডাকে। ফলে প্রথম থেকেই সে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার

সোহিনী বুঝেছিল, কমল মায়ের আঁচলের তলায় থাকা একটা গোবরগণেশ টাইপের ছেলে।

ব্যাপারে একটু জেদি হয়ে উঠেছিল। তার জন্য তাকে কাস্তা বাঈ-এর সঙ্গে কম লড়াই লড়তে হয়নি। একথা ঠিক যে, তাদের চারজনের সংসারে সে রীতিমতো একঘরে। তার শ্বশুর ভবেশ মিত্তির লোকটাও কাস্তা বাঈ-এর বশংবদ! তবু এরই মধ্যে সে অনেক দিন লেগে থেকে তিনতলার এই ঘরটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে হাবিজাবি জিনিস সব দূর করে বেশ পরিপাটি একটা ড্রইংরুম করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বরফি-বরফি পুরনো মোজাইকের ফ্লোর তুলে লাগিয়েছিল ফ্লোর টাইলস। খড়ঘড়ি দেওয়া জাননাগুলো আগের মতো রেখে দিয়ে রং করিয়ে ভারী-ভারী পর্দা ঝুলিয়েছিল। কমলের কাছ থেকে লুটপাট করে টাকাপয়সা নিয়ে একটা নরম, গদিওয়ালা সোফা পেতেছিল। দেওয়ালে একটা কাচের শোকেস করেছিল। এসব করার পর, একটু শান্ত হওয়ার পর সে দেখল, ঘরে তখনও যা জায়গা আছে, তার নাচ প্র্যাকটিস করার পক্ষে যথেষ্ট। তখন সে একটা ইয়া বড় আয়না লাগিয়ে ফেলল দেওয়ালে।

গতকাল বাবার শরীরটা একটু খারাপ হওয়ার জন্য একটাও দেখতে গিয়ে সোহিনী রাতটা বাপের বাড়িতেই কাটিয়ে আজ সকালে এখানে ফেরে। ফিরে সে দেখে যে, তার সাধের ড্রইংরুমখানা একেবারে ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় লন্ডভন্ড হয়ে আছে! সম্ভবত কাল এদিকে কালবৈশাখী হয়েছিল। খোলা জানলা দিয়ে ঝড় ঢুকে এসে ধুলো, বৃষ্টির জলে ঘরটাকে একেবারে কালা-কালা করে রেখে গেছে। একখণ্ড গালচেতে কাদা, সোফায় কাদা, মেঝেতে জল থই-থই! ঈর্ষাকাতর কাস্তা বাঈ ঝড় ওঠার সময় একবার চেকও করেননি যে, তিনতলার সব বন্ধ আছে কি না। কে জানে, সে ছিল না বলে কাস্তা বাঈ-এর সুপুত্রটি রাতে বাড়ি ফিরে আর তেতলায় উঠেছিল কিনা! হয়তো মায়ের পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছিল আহাম্মকটা! ব্যাপার দেখে সোহিনীর চোখ থেকে উপচে পড়ল জল। বাছাই করা কিছু ইংরেজি গালাগালি সে দিয়েছিল মা এবং ছেলের উদ্দেশ্যে। তারপর কাজের লোকদেরও সে বিস্তর বকাঝকা করেছে। এরপর আর কিছু করার নেই। সে গুম হয়ে শুয়ে আছে সেই থেকে। মায়ের খোকন তো সকালবেলাই চলে গেছে চেম্বারে। সোহিনী কমলের সঙ্গে ঝগড়া করার অপেক্ষায় রয়েছে এখন।

এসব করতে-করতে বেলা দেড়টা বাজে যখন নীচ থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'কমল আছে? কমল?' কমলকে কেউ ডাকাডাকি করলে কাস্তা বাঈ-ই সাড়া দেন বেশি, তাই সে চুপ করেই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন, 'অ্যাই কমল? কমল?' শুনল সোহিনী, তখন বেরিয়ে এল বারান্দায়। দেড়টা বেজে গেছে, এতক্ষণে কমলের ফেরারই কথা। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সোহিনী বলল, "ফেরেনি তো!" নীচে রাস্তায় দু'টো কমলের বয়সি ছেলে মুখ উঁচু করে 'কমল, কমল' করে চেঁচাচ্ছে। ছেলে দুটো এপাড়ার কি? রায়বাগানের? মনে হল না সোহিনীর। দু' বছরে সে এপাড়ার ছেলেদের চিনে গেছে। বেশিরভাগই মুখ চেনা অবশ্য। কমলের পাড়াতুতো বন্ধুদের মাত্র দু'-একজনের সঙ্গেই সোহিনী কথা বলে। বাকি ওই শাট্টল-ফাট্টলদের সঙ্গে কথা বলতে রুচিতে বাধে তার। বিশেষত ওই শাট্টল আর লালু। শাট্টলের চোখটা ভীষণ খারাপ। আর লালু ওর স্যাঙাত। দেখলেই মনে হয়, কানের গোড়ায় দুটো দেয়!

"ফেরেনি? সে কী? এই মাত্র বাড়িতে ঢুকল দেখলাম!" বলল একটা ছেলে। সোহিনী অবাক হল, বাড়িতে ঢুকে একবারও উপরে আসেনি? সে বলল, "দাঁড়ান, দেখছি।" তিনতলার সিঁড়ির কাছে গিয়ে সে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, "বল্লিদা? বল্লিদা? দাদা বাড়ি ঢুকেছে?" দোতলার সিঁড়ির কাছে কমলকেই দেখতে পেল সোহিনী। গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছে, উফ, জঘন্য!

"তোমাকে লোক খুঁজছে।"

"ও।"

কমল চলে গেল। সে-ও ফিরে এল টানা বারান্দায়। ছেলে দু'টো কথা বলছে কমলের সঙ্গে, কমল দোতলায়, "বন্ধুর অবস্থা খুব খারাপ। খিঁচ হচ্ছে, মুখ থেকে গ্যাঁজা বেরচ্ছে, তোকে যেতে হবে কমল।"

"দাঁড়া দু' মিনিট," বলল কমল।

সোহিনী দাঁত কিড়মিড় করল, আহা, বিরাট বড় ডাক্তার তো, ব্যস্ততার শেষ নেই। দম ফেলার ফুরসত মিলছে না! কমলের সঙ্গে ঝগড়াটা স্থগিত করে বসে থাকতে হচ্ছে বলে সোহিনীর পাগল-পাগল লাগছে আসলে। কমলের সঙ্গে তো ঝগড়া ছাড়া আর কিছু করার নেই তার! দু' মিনিট বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকেই সে দেখল, কমল শার্ট-প্যান্ট পরে বেরিয়ে যাচ্ছে ব্রিফকেস হাতে। তীব্র মানসিক একটা অভিঘাত তৈরি হল তার কমলকে দেখে। মনে হল, এখনই তিনতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কমলের টুঁটি চেপে ধরে এবং তখনই তার মনে হল কমলের প্রতি ধীরে-ধীরে তার মনে একটা ঘৃণা তৈরি হয়েছে। এই ঘৃণাটাকে একটু যত্ন করতে পারলেই সে কমলের সঙ্গে তার বিয়েটা ভেঙে দিতে পারবে। এই বিয়েটার তার কাছে আর কোনও মূল্যই নেই। সুশিক্ষায়তনের চাকরিটা হয়ে গেলেই সে এই বিয়েটা ভাঙার উদ্যোগ

নেবে।
তার সঙ্গে কমলের বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে। সম্বন্ধটা যখন এসেছিল, তখন তার বয়স ২৩ আর সবে ইন্দ্রর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে! সোহিনী অ্যাকচুয়ালি সব ভুলে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিল। বরকে ভালবাসতে চেয়েছিল। আর সেটা করতে গিয়েই বিয়ের পরপর সে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল বরকে। অন্তত বলা যায় সে চেষ্টা করেছিল আপ্রাণ। তখন সে সবকিছুর মধ্যে দিয়ে কমলকে বোঝাতে চাইত, একটা মেয়ের সর্বস্ব পণ করা ভালবাসা কত মহার্ঘ। সত্যি বলতে, ইন্দ্রের সঙ্গে একটা কদর্য প্রেমের অভিজ্ঞতার কারণেই সোহিনী বিয়েটাকে 'টেকেন ফর গ্রান্টেড' করতে চায়নি। কিন্তু শুরু থেকেই সে বুঝেছিল, কমল একটা বর্ম পরে তার কাছে এসেছে। বিয়ের ঠিক এক দেড় মাসের মাথায় একটা অবোধ ঝগড়াঝাঁটির পর সোহিনী যখন হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়ে কমলকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছে, বুকে মাথা রাখতে চেষ্টা করছে, তখন হঠাৎ কমল তার বাহু ধরে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিতে-দিতে বলেছিল, "সোহিনী শোনো, কাঁদছ কেন? আমি জানি, আমি তোমার জীবনে প্রথম পুরুষ নই। তোমার জীবনে আগে কেউ ছিল!"
সে কান্না থামিয়ে আকাশ থেকে পড়েছিল, "এর মানে কী? আমার জীবনে আগে কেউ থেকে থাকলে এখন আমি তোমার জন্য কাঁদব না কেন? আশ্চর্য? তোমার সঙ্গে বিয়ে হল, তোমাকে ভালবাসার চেষ্টা করছি, এগুলোকে তুমি মিথ্যে ভাবো? আর আমার জীবনে আগে কেউ ছিল তুমি বুঝলে কীসে? প্রেমপত্র দেখেছ? ফোন চেক করেছ?" হাস্যকর ঠেকেছিল সোহিনীর।
"আমি একজন ডাক্তার তুমি এটা ভুলে যাচ্ছ!" বোকার মতো বলেছিল কমল। "ডাক্তার বলে? ও তুমি এই মিন করতে চাইছ?" সোহিনী দক্ষিণ কলকাতার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া মেয়ে, কো-এড স্কুলে ছোটবেলা থেকে ছেলেদের গোপন অঙ্গে ডেঙ্গের তলা দিয়ে হাত দিয়েছে! শরীর নিয়ে তার কোনও শুচিবাই নেই। ১৬ বছর বয়সেই সে এক কাকার সঙ্গে চুমোচুমিতে অভ্যস্ত ছিল। ১৮-১৯ বছরে তার এক সঙ্গে দু'টো বয়ফ্রেন্ড ছিল! এবেলা একটা, ওবেলা একটা মতো...তা ছাড়াও একজন বয়স্ক অদেখা ব্যক্তির সঙ্গে ফোন-প্রেম চালাত সে রাত জেগে! সারা রাত ধরে লোকটা তার সঙ্গে তীব্র কাম-বিহ্বল কথোপথন চালাত। সেই কথাবার্তায় নারী-পুরুষের মিলনের, বলা ভাল, উত্তুঙ্গ রমণ প্রক্রিয়ার কোনও অংশের ধারাভাষ্য অস্পষ্ট ছিল না। সোহিনীও বিছানায় কাতরাত, রাত জাগা লোকটাও বিছানায় কাতরাত। যৌনতার পাঠ তো লোকটাই তাকে দিয়েছে একেবারে সর্বতোভাবে। তারপর তার সঙ্গে প্রেম হল ইন্দ্রের। বলা বাহুল্য, সেই প্রথম সে প্রেমে পড়ল, উন্মাদের মতো প্রেম। অবধারিতভাবে শরীর এল তাতে। দু'টো ছেলেমেয়ের প্রেমে শরীর আসবে না, এ তো ভাবাই যায় না। সে ভাবেওনি, কখনও এতে সে কিছু হারিয়েছে। বিশেষত ভার্জিনিটি তো আইডিয়া মাত্র! সোহিনীর একবার খুব বিশ্রী ধরনের ইউরিন ইনফেকশন হয়েছিল। তখন লেডি ডাক্তার তার

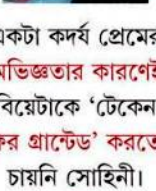

একটা কদর্য প্রেমের অভিজ্ঞতার কারণেই বিয়েটাকে 'টেকেন ফর গ্রান্টেড' করতে চায়নি সোহিনী।

যোনির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তখনও তার প্রথম সঙ্গম অভিজ্ঞতা হয়নি। সেই পরীক্ষায় তার ব্যথা লেগেছিল, ডাক্তার বলেছিলেন, তার ইউটেরাসে ছোট-ছোট সিস্ট আছে, কিন্তু ম্যালিগন্যান্ট নয়। ব্যথা লাগলেও তার রক্তপাত হয়নি। যোনির মেমব্রেন-টেমব্রেন মেয়েদের কবেই ছিঁড়ে যায় তার কি কোনও ঠিক আছে? কমলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে সে বলেছিল, "তুমি তা হলে বিয়ের আগে পরিষ্কার করে জানতে চাওনি কেন? আমি বলে দিতাম যে, আগেই আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। লুকোতাম নাকি? আমার পরিস্থিতি এমন ছিল না যে, মরিয়া হয়ে বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করে একটা মেয়ের সঙ্গে সেক্স করে তারপর সে ভার্জিন কি না বোঝার প্রক্রিয়াটা তো অসহ্য প্রক্রিয়া কমল?"
"জিজ্ঞেস করলে তুমি সত্যি বলতে?" বলেছিল কমল, "কেউ বলে?"
"নাঃ!" তখন সোহিনী বলেছিল, "এটা তোমাদের নর্ম ক্যালকাটার মানসিকতা!" তার এই কথাগুলো শুনে কমল বলেছিল, "দোষটা আমারই। আমার আগেই জানতে চাওয়া উচিত ছিল।"
"তা হলে এবার কী হবে? ইউ ওয়ান্ট ডিভোর্স?" সোহিনী টু দ্য পয়েন্ট কথা বলেছিল, "বাবা-মাকে জানাই তা হলে?"
"সেটা আমি পারি না। বিয়ে যখন করেছি, তখন তোমার দায়িত্ব নিয়েছি। আমার দিক থেকে ডিভোর্সের কথা উঠবে না। এটাও নর্ম ক্যালকাটার মানসিকতা বলতে পার।"
"ডিভোর্স করবে না, গ্রহণও করবে না, এরকমই চলবে?" চিৎকার করে উঠেছিল সে।
কমল আর একটা কথাও বলেনি। একটা ভাঙাচোরা বিপজ্জনক সেতুর উপর তারপর থেকে দু'জনে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে দুটো বছর কেটে গেছে।
সত্যি কথা বলতে, ওই ঘটনার পর সোহিনী দেন অ্যান্ড দেয়ার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথাই ভেবেছিল। দেড় মাসের বিয়ে, নাথিং। এই যুগে এরকম একটা বিয়ে মানুষের জীবনে কোনও লাগই রাখে না, কেউ গুরুত্বও দেয় না। এই তো তার পিসতুতো দিদি তুণারই তো বিয়ের চার মাসের মাথায় ডিভোর্স ফাইল হয়। দশ মাসের মধ্যে ডিভোর্স। মানুষের যেমন চিকেন পক্স হয় বা টাইফয়েড কিংবা ম্যালেরিয়া, ভুগে উঠে একটু দুর্বল লাগে, তারপর আবার সুস্থতায় ফিরে আসে, মুখের স্বাদ ফিরে আসে, চামড়ার লাগ সেরে যায়, নতুন চুল গজায়, সেরকমই এমন বিয়ে থেকে লোকে মুক্তি পেয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়! তার পরিবারে এসব নিয়ে কানাকানি নেই, জল্পনাকল্পনা নেই, হইচই হয় না। তুণাদি তো আবার বিয়ে করে সুখে আছে, বেঙ্গালুরু চলে গেছে। যাকে বিয়ে করেছে, তারও ওরকম একটা খুচরো বিয়ে ছিল। সোহিনীর ক্ষেত্রেও সেটাই হত, কিন্তু সমস্যাটা তৈরি করল সোহিনী নিজেই। একদিন লেভলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কান্তাবাঈকে সোহিনী গুছিয়ে তার নিন্দে করতে শুনল এপাড়ার দত্ত জেঠিমার কাছে। সোহিনী মেয়ে মোটেই ভাল না, কমলের সঙ্গে কোনও বনিবনা নেই, তিনতলায় বসে থাকে, কোনও কাজ করে না, বহির্মুখী মন, ইংরেজি গান চালিয়ে বুঁদ

হয়ে থাকে, ডাকলে সাড়া দেয় না — অভিযোগের পর অভিযোগ! সোহিনী শুনল সব, তারপর ঠিক করল, এই কান্তা বাঈকে টাইট না দিয়ে সে নড়বেই না এবাড়ি থেকে। শাশুড়ি বলেছিল, কমল বউকে সহ্যই করতে পারে না। সোহিনী জেদ ধরল, কমলকে তাকে সহ্য করতেই হবে। এদের মাথায় বসে তাণ্ডব নৃত্য করবে সে। ভীষণ দুঃখও হয়েছিল তার। নীলচে অভিমান। তার তো কোনও দোষই নেই। কমলের যদি অতই চরিত্রবান মেয়ে দরকার ছিল, তা হলে উচিত ছিল কুমারীত্বের পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে বিয়ে করা! তার প্রতি কমল যে অন্যায় আচরণ করছে, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না তার।

এক ধরনের র‍্যাডিকাল ইমপ্যাই হয়েছিল সোহিনীর উপর এই ঘটনার। তার মতো অল্পবয়সি স্বাধীন চিন্তাভাবনার একটা মেয়ে কোনও নর্মস মেনে বা স্বার্থ চিন্তা করে এই অবস্থার প্রতি প্রতিক্রিয়া যোগী, ভাতকে বলে প্রসাদ!"

সেদিন মোক্ষম উত্তরটা দিয়েছিল সোহিনী, "আপনার দাদামশাই বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার, আপনার বাবা ডাক্তার, আপনার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, ছেলে ডাক্তার, কিন্তু আপনি নিজে কী? বলুন, আপনি কী?"

ওমা! এই একটা প্রশ্নে কান্তা বাঈ খেই হারিয়ে অথাব জলে, "আমি কী? আমি? আমি?" এমন একটা প্রশ্ন বছর পঞ্চাশের মহিলাটিকে কেউ কখনও করেনি।

কমল ছিল সেখানে, মায়ের পিছন থেকে বলল, "মা আবার কী হবে? মা, মা!"

"এটা একটা পরিচয় হল? সে তো সকলেই কিছু না-কিছু — মা, বাবা, ভাই, বোন, মামা, মাসি!"

কান্তাবাঈ অশ্রুপাত করতে লাগলেন, "এম এ পাশ বলে এত অহঙ্কার?"

সেদিনই সোহিনী বুঝেছিল এটাই তাকে চালিয়ে যেতে হবে। পুরনো ধ্যান-ধারণা আর বিশ্বাসের মূলে প্রতিদিন আঘাত মুঠো ধরে তোমায় নামিয়ে নিয়ে যাই নীচে, আমাকে রমণ করো, যদিও অনিচ্ছুক মানুষের সঙ্গে শোওয়া জঘন্য অপরাধ — তবু আমি কী করব? দোষ তো আমার নয়। দোষ আমার কখনওই নয়।

প্রতিবারই মিলনের পর সে অকৃপ্ত অসন্তুষ্ট ঘুমোতে যায়। প্রতিবারই তার মনে হয়, কমলকে যদি একটা বারও জাগাতে পারত! একটা বারও যদি শিকারি নেকড়ের মতো তার টুঁটি টিপে ধরত কমল, সে ওকে তা হলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিত। এ এক অদ্ভুত অভিশপ্ত আবর্ত! যত বার কমলকে সে এই অবস্থায় চুমু খেতে চায়, কমল মাথাটা সরিয়ে নেয়, ঘাড় শক্ত করে রাখে। সোহিনীর মনে হয়, ঘুষি মেরে ওর চোয়াল খুলে দেয় তখন! মায়ের ভেড়ুয়া ছেলের আবার এত শক্ত ঘাড় কি? হাঃ, ভারী তো মূল্যবোধ, ভারী নীতিবাগীশ! মূর্খ! আমার জীবনটা নষ্ট করল কাপুরুষটা! তার লাভ কি দেবে? তিনতলার বারান্দায় বুঁকে থাকা রেনপাইপ বেয়ে উঠে আসা মাধবীলতার ঝাঁকড়া ডালপালা সরিয়ে সোহিনী দেখল, কমল তিন মাথার মোড় থেকে ডান দিকে ঘুরে গেল। একটা বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোহিনী ঘরে ফিরছিল স্নান করে নেবে ভেবে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল নিমাই খুড়োদের রকের দিকে। লালাটা এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের পাতা পড়ছে না, ঠোঁট কামড়ে আছে দাঁতে। ঠাস করে একটা থাপ্পড় মারতে হয়! শাঁটুলের এই তাকিয়ে থাকাটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। সেদিন তো একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে ফেলেছিল ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে। একদম নির্লজ্জ বেহায়া। আজকাল রাতেও অনেক সময় বসে থাকে ওই রকে। মাথাটা গরমই ছিল সোহিনীর ভীষণ, সে আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করল না। হাত তুলে একটা চড় দেখাল শাঁটুলকে। আর দু' চোখ থেকে ঝরিয়ে দিল বিতৃষ্ণা, ঘৃণা! সে ক্লাসিকাল ডান্সের মেয়ে। সহজেই চোখ এবং হাতের মুদ্রা দিয়ে যে-কোনও রসের সঞ্চার ঘটাতে পারে।

চড়টা দেখিয়েই সোহিনী কেউ দেখল কি না বোঝার জন্য এদিকে তাকাতেই দেখল, কালো বিদেশি গাড়ির জানলা থেকে প্যাট-প্যাট করে তাকে একবার আর শাঁটুলকে একবার দেখছে আয়েষাদি! তার চোখেই পড়েনি, সত্যর দোকান থেকে গাড়ি থামিয়ে পান কিনছে আয়েষাদি। রোজই এই সময় আয়েষাদি মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে ফেরে।

সোহিনীর রাগ হচ্ছিল ভীষণ। সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করল না। হাত তুলে চড় দেখাল শাঁটুলকে।

দেখায়নি। ছেলেমানুষিই ছিল তার আচরণে। সেই থেকে একটা ঠান্ডা যুদ্ধের বাতাবরণে বসবাস করছে সোহিনী, এই অন্যদি ঘোষাল ষ্ট্রিটের বাড়িতে। কমলের সঙ্গে তার কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই বললেই চলে। পুরোটাই একটা সামাজিক আনপ্রলন। এই করতে-করতে দু' বছরে কান্তা বাঈ আর কমল যথেষ্ট কোণঠাসা তার দ্বারা। সে জড়ভরত হয়ে তো থাকে না। রীতিমত প্রতাপ আছে তার। মাঝে-মাঝেই নিজের তেজ বিকিরণ করে এদের নাস্তানাবুদ করে সোহিনী! টানা ইংরেজিতে সে যখন চিৎকার করতে থাকে, কমল আর কমলের মা পালানোর পথ পায় না। একদিন কমলের মা তাকে বলতে এসেছিলেন, "ন্যাখো, অত ইংরেজি কপচিও না! আমার দাদামশাই বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার ছিলেন। উনিও অত ইংরেজি বুলি ঝাড়তেন না। বাড়িতে খেটো ধুতি আর খড়ম পরতেন, দু' দিনের করতে হবে। নইলে ইংরেজি-টিংরেজি সে খুব একটা বলতে চায় না। কিন্তু যারা তার বিপক্ষে, তাদের তো ধরাশায়ী করতে গেলে তাদের দুর্বলতাটাই এমনকাশ করতে হবে। তবে আর বেশিদিন এদের সঙ্গে এই ইঁদুর-বিড়াল খেলবে না সোহিনী।

সুশিক্ষায়তনের চাকরিটা হয়ে গেলেই, ব্যস! কিন্তু যদি না হয়? ইস, এই চিপ খেয়োখেয়ির মধ্যে না থেকে পোস্ট ডক্টরেটটা করে নিলেই ভাল করত।

কমল দুপুরে আজকাল আর প্রায় তিনতলায় আসেই না। রাতেই বা কেন এসে শোয় তার পাশে, কে জানে? নিজে থেকে কমল কখনও এগোয় না তার দিকে। শরীরের জ্বালায় জ্বলতে-জ্বলতে সে নিজেই টানাটানি করে কমলকে সময় অন্তর। করে, বেশ করে! বিয়ে করেছ কেন? করতেই হবে, বিয়েও করবে, অধিকারও করবে না। ডিভোর্স দেবে না যখন, তখন চড়-থাপ্পড় খাও, তখন চুলের

এই আয়েষা নামক পৃথুলা ধনী গৃহিণীকে সোহিনী ভীষণ ভয় পায়। আয়েষাকে এপাড়ার অনেকেই পছন্দ করে না। কিন্তু কমল আবার আয়েষার অতিরিক্ত অনুরাগী। আয়েষার বাড়ির তিনতলায় মাঝে-মাঝে ছোট্ট একটা মদ্যপানের আসর বসে। সেখানে মধ্যমণি আয়েষা স্বয়ং! কমল সেখানে নিয়মিত যায়। আগেও কী একটা কারণে আয়েষা তার আর কমলের মধ্যে বেশ উচ্চ পর্যায়ের গন্ডগোল বাধিয়ে দিয়েছিল। এসবই আয়েষার টাইমপাস। এর বিরুদ্ধে ওকে খেপিয়ে তুলতে তার জুড়ি মেলা ভার। এই মুহূর্তে আয়েষার চোখে অন্য একটা রং খেলা করছে, 'ধরা পড়েছ চাঁদু, আহা!' ঠোঁটের প্রান্তে শিরা-উপশিরার মতো হাসির রেখা। আয়েষা হাসলে ওর পাতলা ঠোঁট আরও সরু হয়ে যায়, তখন ওকে আরও কুচক্রী দেখায়! সোহিনী আয়েষার ওই চেরা হাসির দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইল আর তখন সে লক্ষও করল না শাটুল বিশ্রী ভাবে হাসছে আর আঙুলমোড়া কাটছে। আর গুনগুন করে গাইছে, 'লীলাবালি, লীলাবালি, ভর যুবতী, আহা ভর যুবতী, হুঁ-হুঁ ভর যুবতী, হাঁ ভর যুবতী...'

যত বার 'ভর যুবতী' বলছে শাটুল তত বার সে ভাবছে, ক্যারমের টেবিলের উপর চিৎকরে ফেলা একটা মেয়ে। মেয়েটা সোহিনী, মেয়েটা ছটফট করছে, তাতে শাড়ি উঠে যাচ্ছে উপরে, আরও উপরে উঠতে-উঠতে ঠাসানো ময়লার মতো সাদা দুটো ম্যাসেল থাই, একদম নির্লোম! শাটুল মন থেকে জানে, কমলের বউটার উরু, উরুসন্ধিস্থল একেবারে ডাকাতে হবে! পুরুষের যা আছে, সব নিংড়ে, শুষে, টেনে নেবে, ছিবড়ে করে নেবে! শাটুল গান গাইতে-গাইতে শার্টের বোতাম খুলতে-খুলতেই এগোতে থাকে বাড়ির দিকে। তার চোখ ঝুলে থাকে ভবেশ মিস্ত্রিরের তিনতলার বারান্দায়, আয়েষা যে তাকেও দেখছে, সেটা শাটুল লক্ষও করে না।

॥ ৫ ॥

আয়েষা সহজে কিছু ভোলার মেয়ে নয়। কমলের ওই জন্তি বউটা আর শাটুলের ইশারা-ইঙ্গিত দেখে হজম করার মেয়ে আয়েষা নয়! সে যদি অত নিরীহ টাইপ হত, তা হলে এই শক্ত জমির উপর আজ আর তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত না। সেই দুপুরেই সে ভেবে নিয়েছিল, কমলের কানে কথাটা তুলতে হবে তাকে। শুধু কমলের কানে কেন, বিকেলে রাধাদিদের রকে বসে একটু রসিয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাটা বলে দিলেই হল। পাড়ায় টি-টি পড়ে যাবে! কমলের বউটাকে সে দু' চক্ষে সহ্য করতে পারে না। কমল নিজেই নিজের বউকে নিয়ে জেরবার! জিজ্ঞেস করলে কিচ্ছু বলে না অবশ্য। কমল মানুষটা তো বড্ড ভাল। সৎ, সাদাসিধে। আসলে আয়েষা এখন চালাক লোকজন একদম দেখতে পারে না। কেউ তার উপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেই আয়েষা তাদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে চেষ্টা করে। অভীককেই ছাড়ে না আয়েষা।
পান নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে ঠিক করেছিল, কমলকে একটা ছুতোনাতায় রাতে ডেকে পাঠাবে বাড়িতে। কিন্তু বিপত্তি শুরু হল তখনই। তার ছোট মেয়েটা বড়ই দুরন্ত। সারাক্ষণই লাফাচ্ছে। বড় মেয়ে বাঁধন জন্ম থেকে শান্তশিষ্ট, মেয়েলি। যেমন হওয়ার কথা আর কী।

পুতুল খেলতে ভালবাসে, ঘর সাজাতে ভালবাসে, কে কোথায় কোন শাড়ি পরল, কোন গয়নাটা পরল, পড়াশোনার চেয়ে এসবেই ওর ন্যাক বেশি। সেই সঙ্গে বাঁধন একটু বোকাও আছে। ১৬-১৭ বছর বয়স হল, কিন্তু নিজের ভাল-মন্দ একদম কিছু বোঝে না! অনেকটা আয়েষা নিজে যেমন ছিল ছোটবেলায়, গোবেচারা জাতের, সেরকম। লোকে অবশ্য বিশ্বাস করে না সে গোবেচারা ছিল! সকলেই ভাবে, সে জন্ম থেকেই সেয়ানা! নইলে গোলক মাঝি লেনের খোঁয়াড় থেকে সে মোহিনীমোহন লেনের এই অট্টালিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না! সে যাই হোক, বাঁধন বড়লোকের আদুরে মেয়ের যেমন হওয়া উচিত তেমনই হয়েছে। এখনও বাঁধনের জন্মদিনের কেকের ডিজাইন সেই ঘাগরা পরা পরি। কিন্তু ছোট মেয়ে বাঁধুলির ধরনটা আলাদা। ও রঙের মধ্যে আধিপত্য করার স্পৃহা নিয়েই জন্মেছে যেন। অনেকটা তার শ্বশুর বিশ্বম্ভর ঘোষের মতো। অনেকটা এখন সে যেমন, সেরকম। বাঁধন যেমন জন্ম থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ল, কিন্তু ইংলিশে কথা প্রায় বলতেই চায় না।

"বলিস না কেন?"

"বলি তো। কিন্তু এখানে সকলেই তো বাঙালি, তাদের সঙ্গে ইংলিশ বলতে লজ্জা করবে না?"

"কষ্ট করে শিখলি, বলবি না?"

"মা, তুমি না সত্যি! কষ্ট কোথায়?"

উফ, বাঁধন কি জানবে, কষ্ট কি না! সে কি জানে, কোনও কালে ইংলিশে আয়েষা বত্রিশের বেশি পায়নি! এখন ব্যাগে হাজার-হাজার টাকা, ক্রেডিট কার্ড, তবু শর্পিং মলে 'ইয়েস ম্যাডাম, হাউ মে আই হেল্প ইউ' শুনলেই তার কেমন হীনমন্যতা হয়, তখন সে খুব রাগী-রাগী আচরণ করে ফেলে। এদিকে বাঁধুলি একদম উল্টো, ফটর-ফটর ইংলিশ বলছে, বাড়িতেও কাঁটা-চামচে খায়, ভাত-ডাল মুখে রোচে না, সারাক্ষণ পিৎজা আর বিদেশি ফুড জয়েন্টের স্যাণ্ডউইচ-স্যালাডের জন্য বায়না। এদিকে সেরকম কোনও দোকানই নেই! ব্যস, গাড়ি পাঠাও সিটি সেন্টার সল্টলেক! মেয়ের পুতুল খেলায় মন নেই। ক্রিকেট খেললে বলবে, জেন! হাত-পা ছুড়ে কান্নাকাটি! ১১ বছরের মেয়ে শর্টস আর গেঞ্জি ছাড়া কিছু পরবে না। সালোয়ার-কামিজ? 'মা গো, তুমি পরো! ওসব জরি-ঝুমকি, তুমি পরো। পাথর সেটিং গয়না তুমি পরো না, তুমি পরো। প্লিজ, ডোন্ট আস্ক মি টু ড্রেস আপ লাইক অ ক্লাউন!' বাঁধুলি ভীষণ দাম্ভিক, ভীষণ অহঙ্কারী। আর সেই কারণে গোপনে বাঁধুলিকেই বেশি পছন্দ করে আয়েষা। ছেলে হল না? এই তো ছেলে, ব্যবসা দেখবে! বাঁধন তো তাও এখনও 'দিদা, দিদা' করে গোলক মাঝি লেনে ঢোকে, বাঁধুলি পা-ই রাখবে না!

সেই ছোট মেয়েকে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরে গাড়ি থেকে নামছে আয়েষা, মেয়ে লাফ দিয়ে নামল আর পা মচকে পড়ে গেল একেবারে উল্টোনো ছাতার মতো! অভীকও তখন বাড়ি ঢুকছে দুপুরের ভাত খেতে। সকাল থেকেই আজকাল অভীক মদ্যপান শুরু করে। ফলে অভীকের চোখ লাল, বেশ একটু শিবাশিস-শিবাশিস ভাব, পা সামান্য টলল হয়তো, দেখল, মেয়ে পড়ে গেছে, তাকালই না! চলে গেল সোজা উপরে। ফলকই ভরসা, ধরাধরি করে সে আর ফলক বাঁধুলিকে তিনতলায় তুলে আনল। পড়ে গিয়েও মেয়ে একটুও কাঁদেনি। কিন্তু ক্রমশ ব্যথা বাড়তে ছটফট করতে লাগল। পা ফুলে ঢোল হয়ে গেল, নীল জমাট কালশিটে। ব্যথা পেয়েছে বলে বাঁধুলিকে নিজের ঘরে শুইয়েছিল আয়েষা। দোশোনো করতে সুবিধে হবে ভেবে। নইলে সে এমন মোটা হয়ে গেছে যে লোহলা তিনতলা করতে কষ্ট হয়। সিঁড়ি ভাঙতে পারে না। বাঁধুলি শুয়ে-শুয়ে 'উঃ আঃ' করছে...অভীক এসে কী হম্বিতম্বি শুরু করল!

"নীচে নিয়ে যাও না! এখন আমি একটু খেলা দেখব, ঘুমোব। ওর অসুবিধে হবে।"

"এখন ও এঘরে থাকবে, আমার কাছে। তোমার যেতে হয়, অন্য ঘরে যাও।"

"আমার ঘরে আমি থাকব।"

"এটা আমারও ঘর!"

"ধুস শালা, যত জঞ্জাল এসে জুটেছে!" বলে অভীক চলে গেল ঘর থেকে। তিনতলায় একটা বসার ঘর আছে, সেখানে সোফা-টোফা পাতা, মেঝেতেও গদি পেতে তাকিয়া-টাকিয়া দেওয়া আছে, একটা টিভিও আছে বিয়াল্লিশ ইঞ্চির আর আছে শোকেস ভর্তি মদের বোতল, মদের আসর ওখানেই বসায় অভীক। আয়েষাও তবে আয়েষা কখনও কাউকে মদ খেতে ডাকে না। সে অন্য-অন্য উপলক্ষে পাড়ায় নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে লোকজন ডেকে গ্যাদারিং করে। যেমন হোলির দিন, পয়লা বৈশাখে, সরস্বতীপুজোয়, লক্ষ্মীপুজোয়, কালীপুজোয়। তখন কেউ যদি বলে 'আয়েষাদি একটু বের করো না!' সে বের করে দেয়, নিজেও খায়। অভীকই তো খাওয়া ধরিয়েছে। অবশ্য আজকাল আয়েষা একদম একা খেতে পারে না, কাউকে লাগে তার। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই ঘটাটা আজকাল সঙ্গের পর তারই দখলে চলে আসে। তার গ্রুপ, অভীকের গ্রুপ আলাদা! অভীক বেশিরভাগ দিনই সঙ্গে জমাট বাঁধলে পার্ক স্ট্রিটের পানশালায় গিয়ে ওঠে, প্রচুর টাকা ওড়ায়। সেও টাকা ওড়াচ্ছে। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! তবে আয়েষা অনেক সৎ কাজেও অর্থ ব্যয় করে।

জঞ্জাল? হাসি পায় আয়েষার। সে গায়েই মাখে না অভীকের কথা। কিন্তু বাঁধুলি রেগে ওঠে, "চলো, চলো, আমি নীচে যাবো। এখানে থাকব না।"

সে বলে, "চুপ করে শুয়ে থাক। আর উপর-নীচ করতে হবে না।"

"শোনো মা, আমাকে নীচে নিয়ে চলো। বিকেল হলেই তো তুমি পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়বে। আমার জন্য এত ওরিড হতে হবে না। ইউ মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস।"

বাঁধুলি কি তাকে আজকাল ভিতর-ভিতর ঘৃণা করে? কেন? তা কেন হবে? মেয়েদের তো আয়েষা বুক দিয়ে আগলে বড় করেছে। বিশেষত বাঁধুলিকে বাঁধনের চেয়েও বেশি যত্ন করেছে। কারণ, কেউ চায়নি তার দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হোক। অভীক আর বিশ্বম্ভর ঘোষ, দু'জনেই পুত্রসন্তান চেয়েছিল। শ্বশুর তো বেনারসে গিয়ে বিশ্বনাথের কাছে মানত করে এসেছিলেন। এই ইতিহাস থেকে তো আয়েষা নিজেই মেয়েকে আড়াল করেছে। সেই মেয়ে যত বড় হচ্ছে, মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করছে! হায়, কপাল! কোনও কথাই শুনল না বাঁধুলি, তোতলায় চলে গেল।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তারস্বরে টিভি চালিয়ে দিল। তাইল্যান্ড থেকে একটা বাম কিনে এনেছিল আয়েষা। মচকানো, ব্যথায় লাগালে খুব কাজ দেয়। সে বারবার দরজা ধাক্কাল মেয়ের ঘরের, "আচ্ছা শোন, এই বামটা লাগিয়ে নে। দাগ, সেরে যাবে ব্যথা!" কোনও ফল হল না। বাঁধন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বোনকে ডাকল, তা-ও মেয়ে শুনল না। আয়েষা তখন বাঁধনের ঘরে গিয়ে বসল একটু। ডালিয়া ছিল, ডালিয়া রোজই আসে দুপুরের দিকে। অগত্যা মেজাজটা ঠিক করতে আয়েষা ডালিয়ার সঙ্গে গল্প করতে লাগল তখন, "কী রে, ভানু এসেছিল শুনলাম। এতদিন পর হঠাৎ?"

ডালিয়া পায়ে নেলপলিশ লাগাচ্ছিল একটা নীল রঙের। বাঁধনের বোধ হয় এক

ক্রেট নেলপালিশ আছে। রোজ লাগাচ্ছে, রোজ তুলছে। মাঝে-মাঝে তাকেও লাগিয়ে দেয়। ডালিয়া মুখ তুলে বলল, "এমনিই এসেছিল, ভানুদি তো আসতেই চায়। বরটা আসতে দেয় না। বাবার সঙ্গে একদম আদায়-কাঁচকলায়। বাবাকেও তো তুমি জান, ভীষণ জেদি। ভানুদিকে বাবা ভালইবাসে। কিন্তু ওই, বাবার অমতে বিয়ে করেছে! মা কত বলে 'ভানুর বাবা-মা নেই, আমরা ছাড়া কেউ নেই। একটু ডাকি, একটু আসতে বলি, পুজোয় একটা শাড়ি পাঠাই' বাবা কিছুতেই রাজি হবে না!"

অভীকের এক সময় খুব পছন্দ ছিল ভানুকে। দু'জনে একই রাস্তার এমাথা-ওমাথা, একসঙ্গে বড় হয়েছে, সে-ই বরং সেদিক থেকে ভেবে দেখলে বেপাড়ার মেয়ে। ওদের দু'জনের-দু'জনকে পছন্দ ছিল, আয়েষা মাঝখানে ঢুকে পড়ল কী করে? সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ডালিয়া বলল, "ভানুদিকে কী লরুণ দেখতে হয়েছে, জান তো আয়েষাদি? অন্য স্টাইলের দেখতে একদম! আর যখন পরব!" বলল সে।

বাঁধনটা তো বোকাই, অমনই বলল, "তোমার আছে মা সিল্ক মঙ্গলগিরি? কেমন শাড়ি গো? দেখাও, দেখাও না?" সিল্ক মঙ্গলগিরি? সিল্ক মঙ্গলগিরি! কোথায় পাওয়া যাবে সিল্ক মঙ্গলগিরি? বেনারসি কুঠি-টুঠি? নাঃ, এদিকে পাওয়া যাবে না। শ্যামবাজার, হাতিবাগান, কলেজ স্ট্রিটে নয়, তা হলে সিটি সেন্টার? নাকি পার্ক স্ট্রিট? গড়িয়াহাট? মোটা শরীর নিয়েও তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আয়েষা। বাঁধনকে বলল, "শোন, আমি একটু বেরচ্ছি। দরকার আছে। বিকেল হলে সাবিত্রী মাসিকে বলবি বোনকে দুধ দিতে। চাউমিন করে দেবে, তোরা খেয়ে নিস।" বাঁধন বলল, "মা, আমি আর ডালিয়ামাসি একটু হাঁড়ির গলিতে ফুচকা খেতে যাব? গাড়ি নিয়ে নেব।"

তার তখন সময় নেই, পারমিশন দিয়ে দিল আয়েষা! তারপর ফলকাতে ডেকে নামতে লাগল নীচে। ভুলেই গেল বাঁধুলি ব্যথা পেয়েছে।

গাড়ি ছুটল পার্ক স্ট্রিটে। 'রং কে' শাড়ির দোকান থেকে অজস্র শাড়ি কিনেছে আয়েষা জীবনে। ২০ হাজার, ২৫ হাজার টাকার শাড়িও কিনেছে কত। নেট, জারলৌসি, জরি-ঢুমকি, প্যাচওয়ার্ক, বাঁধনি, ক্রেপ ট্রেপ তো অগুনতি। ওরা তাকে শাড়ি গছাতে চেষ্টা করল, সিল্ক মঙ্গলগিরি কোথায় পাবে, বলতে পারল না। সম্মানের খাতিরে সে একটা আট হাজার টাকার সালোয়ার সুট কিনে সিচ্চ করতে দিয়ে বেরিয়ে এল। তা হলে সিল্ক মঙ্গলগিরির জন্য এবার সে কোথায় যাবে? সল্কে সাতটা নাগাদ যখন গড়িয়াহাট হয়ে আয়েষা দক্ষিণাপণে ঢুকল, তখন দোকানপাট বন্ধ হওয়ার মুখে। আশ্চর্য, তার শপিংয়ের তালিকায় কেন কোনওদিন দক্ষিণাপণ পড়েনি? গোলপার্কের পর এই ঢাকুরিয়ার এদিকটা সে প্রায় কোনওদিনই আসেনি। যখন সাউথ সিটি তৈরি হচ্ছিল, সেই ২০০৮-'০৪ সালে তখন ৩৫ তলা আবাসন তৈরি হচ্ছে, কেমন হচ্ছে দেখতে এসেছিল সে একবার অভীকের সঙ্গে। তখন বাঁধন হয়েছে। অভীক প্রায় রবিবারই দু'-একজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে, তাকে নিয়ে, মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত গাড়ি ড্রাইভ করে। তারপর সাউথ সিটিতে তারা কত এসেছে। কিন্তু ঢাকুরিয়া দিয়ে আসেনি, এসব জায়গা তার কাছে একদম নতুন! একে-ওকে জিজ্ঞেস করে ঠিক দোকানে পৌঁছে যখন সে সিল্ক মঙ্গলগিরি দেখল, তখন নেহাতই নিরাশ হল! ও বাবা, এতে কিচ্ছুই তো নেই! সিল্কের থানের ওপর জড়ির পাড়। ব্যস? হেলায় তিন-চারটে মঙ্গলগিরি কিনে ফেলল সে। এটা দেখি, ওটা দেখি করে আরও কয়েকটা নানা খটমট নামের শাড়ি, তার ফর্সা নধর চেহারা, হাতে মোটা-মোটা বালা, ব্যাগে গোছা-গোছা নোট, দোকানটার সেলসগার্লরা তাকে দারুণ খাতির করল। ওখানে ১৭-১৮ হাজার টাকার শাড়ি কিনে বেরিয়ে একতলার চত্বরের দোকানহীন পসরাগুলো থেকেও সে দু'-চারটে জিনিস কিনল।

সাদা বগল কাটা ঢিলেঢালা ম্যাক্সি ২০০ টাকা করে দুটো। লাল, নীল, হলুদ টেবিল ম্যাট ছ'টা, বাঁধন আর বাঁধুলির জন্য দুটো রাজস্থানি জুতি। এসব কিনে যখন বাড়ি ফিরল আয়েষা, তখন রাত সাড়ে ন'টা। সে এসে দেখল, বাঁধুলির ঘরে বসে আছেন শাশুড়ি আর বাঁধন। বাঁধুলির বেশ জ্বর এসেছে। অভীক বাড়িতে নেই। বিশ্বম্ভর ঘোষ একতলায় ৪০ বছরের পুরনো বোতলের বন্ধুর সঙ্গে দরজা বন্ধ করে পান করছেন!

তাকে দেখেই বাঁধন বলল, "ফুচকা খেয়ে ফিরে দেখি বোনের জ্বর। ঠামিকে ডাকলাম নীচ থেকে। কমলকাকুকে ফোন করেছি। আসছে!"

শাশুড়ি তার সঙ্গে কথা বলেন না, বাঁধনকে শাশুড়ি বললেন, "এই তো, মা এসে গেছে। আমি যাই, গোপালকে শুইয়ে আসি।"

আয়েষা তাড়াতাড়ি উপরে ছুটল জিনিসপত্র রাখতে।

শাশুড়ি তার সঙ্গে কথা বলেন না, বাঁধনকে শাশুড়ি বললেন, "এই তো, মা এসে গেছে।"

শাড়িটাও পরে এসেছিল দারুণ, ওরকম শাড়ি তোমার একটাও নেই, আমি শিওর!"

এইটুকু শুনেই গা-পিত্তি জ্বলে গেল আয়েষার। তার নেই, এমনকী শাড়ি আছে ভানুর শুনি? সেটার চেয়েও বেশি তার রাগ হল ডালিয়ার কথা বলার ধরন দেখে। থাকুক না-থাকুক, তুই বলবি কেন? আছে কি নেই, তুই কি জানিস?

"আমার কত শাড়ি আছে জানিস?" মোটা গোল হাত নেড়ে আয়েষা বলল, "তোর কল্পনাতেও আসবে না রে ডালিয়া।"

"তা তো বলিনি আয়েষাদি," ডালিয়া বাঁ হাতে লাল নেলপলিশ লাগাচ্ছে এখন, "বললাম, ওরকম শাড়ি আমি তোমাকে কখনও পরতে দেখিনি! বলল, শাড়িটা সিল্ক মঙ্গলগিরি। তোমার আছে?"

"আছে কি নেই, সেটা দেখতেই পাবি

॥ ৬ ॥

পা মচকে পড়ে গিয়ে ব্যথায় জ্বর এসে গেছে, এর জন্য একেবারে মাথায় বাজ পরার মতো কিছু হয়নি। তবু মায়ের প্রাণ তো, ছোটদের জন্য কাতর হতেই হয়। তা ছাড়া মেয়েদের ব্যাপারে আয়েষা যথেষ্ট স্পর্শকাতর। কারণ, ছোটবেলাটা তার শুধু

অনাদরেই কেটেছে। জ্বর হোক, জারি হোক, ডাক্তার-বদ্যির ব্যাপার ছিল না, খুব কিছু হলে দু' টাকা দিয়ে নাম লিখিয়ে কয়লার গলির হোমিওপ্যাথির বড়ি, নিজের এই অতীতকে সারাক্ষণ অস্বীকার করতেই আয়েষা যা করে, সব বেশি-বেশি করে। কমলকে নিজেই ফোন করল সে। কমল বাঁধুলিকে দেখে-টেখে ওষুধ লিখে দিল। ফলককে পাঠাল আয়েষা ওষুধ আনাতে। তারপরও কমল যেমন পাড়ার পেশেন্ট দেখতে গিয়ে বসে চা-টা খায়, গল্প-টল্প করে, অন্য কোথাও থেকে ডাকাডাকি করলে তবে ওঠে, নইলে আড্ডাই মারে, তেমনই বাঁধুলির ঘর থেকে কমল যখন বেরচ্ছে অভীক ঢুকল, বলল, "কী রে, তুই?"

"বাঁধুলির জ্বর।"

"ও, চলে যাচ্ছিস?"

"এই যাচ্ছিলাম।"

"চল, উপরে চল।"

অভীকের সঙ্গে আজ এসেছে পূর্ণেন্দু আর সজল। চারজনে উপরে চলে গেল।

সেদিন কমলকে কিছু বলার কথাটা মনেই থাকল না আয়েষার। পরের দিন তার ভীষণ ঝামেলা গেল পার্বতীকে নিয়ে। পার্বতী সেন্টারের আয়া হিসেবে ঢুকেছিল বাঁধুলি হওয়ার সময় থেকে। এত বছর টিকে গেছে। সকালে আসে, রাতে যায়। পরের দিন পার্বতী এসে দুম করে বলল, "তারকেশ্বর যাব। চারদিন ছুটি দাও।"

টাকাপয়সা চাও, আয়েষা উদার হস্ত। কিন্তু ছুটি চাও, আয়েষা দেবে না! সে মনে করে, তার চাকরবাকর ২৪ ঘণ্টা, ৩৬৫ দিনই তার চাকরবাকর। সে বলল, "বাঁধুলির জ্বর, কে দেখবে। ছুটি-ফুটি হবে না!"

পার্বতী বলল, "ওরকম বোলো না বউমণি। ছেলের নামে মানত আছে। যেতে হবেই। না যদি ছুটি দাও, তা হলে আমাকে কাজ ছাড়তে হবে!" পার্বতী এতটা বলত না। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, আয়েষা ছুটি দেবে না। বিস্তর ঝামেলা করবে।

এদিকে 'মানত' শুনেই আয়েষা ভাবল, তা হলে দু'দিনের ছুটি মঞ্জুর করবে। ধমকে বলবে, দু'দিনের মধ্যে ফিরতে হবে। কিন্তু পার্বতী এতটা বলে ফেলল বলে সে বেঁকে বসল। সে বলল, "তুমি টাকাপয়সা বুঝে নিয়ে বিদেয় হও! আয়েষা ঘোষকে চাপ দিয়ে কাজ আদায় করবে? কেউ পারল না, আর তুমি! টাকা ফেললে লোকের অভাব? ওসব ভয় তুমি অন্য জায়গায় দেখিও পার্বতী!"

পার্বতীর সঙ্গে আয়েষার ১২ বছরের আন্ডারস্ট্যান্ডিং। দু'-দুটো সিজারিয়ান সেকশন হয়েছিল তার। বাঁধুলি হওয়ার পরপর সে শুয়ে থেকেছে বহু দিন। পার্বতীই প্রকৃতপক্ষে বড় করেছে মেয়েকে। কিন্তু এই কথোপকথনে এক নিমেষে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ধসে পড়ল। পার্বতী চোখের জল চেপে নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করে তরতরিয়ে নেমে গেল নীচে।

লালু সেই সময় উপরে আসছিল। আয়েষাকে এসে লালু বলল, "কী হয়েছে গো আয়েষাদি? পার্বতীদি 'টাকার গরম, টাকার গরম!' করতে-করতে চলে গেল, মনে হল, খুব খচে আছে!"

আয়েষা নিজের ঘরের সোফার উপর কোমরে হাত দিয়ে বসে রইল স্তম্ভিত হয়ে! পার্বতী যে পার্বতী তার জুতোর তলায় থাকে, পিঁপড়ের মতো টিপে মারতে পারে যাকে সে, তার এত চোপা? এই তো দু'দিন আগে অবধি একটু স্থির হয়ে সে বসলেই পার্বতী হার্বাল ম্যাসাজ তেলটা এনে তার পায়ে মালিশ করে দিত। সারাক্ষণ সেবা করার জন্য ছটফট করত যেন, আর সেই পার্বতী...হঠাৎ আয়েষা এত রেগে উঠল যে, উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তার মাথা ঘুরে গেল। তার ধবধবে ফর্সা মুখ একরকম লাল হয়ে ফুলে উঠল অপমানে। ভাগ্যিস লালু দাঁড়িয়ে ছিল সামনে, সে টলে যেতে লালু ধরে ফেলল তাকে।

আয়েষাকে যেভাবে ধরল লালু, তাতে তার মনে হল, নিজের হাতখানা তার দু' থাক নরম গদির মধ্যে ঢুকে গেছে! আয়েষাদি দুর্দান্ত সুন্দরী ছিল। একদম শ্রীদেবী কিংবা দিব্যা ভারতী স্টাইলের। কিন্তু এখন পুরো জয়ললিতা হয়ে গেছে! আয়েষাদিকে দেখে আর কারও কোনও কাম ভাব জাগার কথা নয়। তবু মেয়েমানুষ তো, আর ছোটবেলায় আয়েষাদির ট্যাসেল ঝুলিয়ে নিতম্ব দুলিয়ে হেঁটে যাওয়াটা এখনও মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি বলে আয়েষাদির শরীরের ভাঁজে খাঁজে হাত দেওয়া অবস্থায় মাথায় পাপ চিন্তা যেন না আসে ভেবে জিভ কাটল লালু মনে-মনে। তবু পাপচিন্তা এলই তার মনে! টিভিতে একটা কী যেন চ্যানেলে দেখায় না বিরাট ফোলানো, হাওয়া ভরা গদির উপর দিয়ে লোকে হাঁটার চেষ্টা করছে, তারপর টুপ করে জলে পড়ে যাচ্ছে — লালুর হঠাৎ মনে হল, আয়েষাদির উপর চড়ার চেষ্টা করলে প্যাঁকাটির মতো রোগা লালু সমান্দার ওই রকম টুপ করে খসে পড়ে যাবে! লালু মনে-মনে গালে চড় কষাল নিজের, পাঁক, পাঁক! মানে একদম খালের জলের পাঁক! আয়েষার অবস্থাও তথৈবচ! সে দামি-দামি শাড়ি পরে, গয়না পরে, খুব সাজগোজ করে, মেয়েলি কতগুলো ব্যাপারে সে ভয়ানক পারদর্শী। যেমন পরচর্চা, পরনিন্দা, লাগানো ভেজানো, পরশ্রীকাতরতা, আবার সে হইহইও করে খুব। পাড়া মাতিয়ে রাখে, এই পাড়ায় মাদারস ডে পালন করল, এই পাড়ায় ফাংশন করাল মেয়ে, বউদের দিয়ে, এই বিসর্জনের দিন নাচতে-নাচতে বাগবাজার ঘাটে চলল, কখনও ঝাঁপিয়ে পড়ে কাউকে হাসপাতালে পাঠাল, কারও মেয়ের বিয়ের জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়ে ব্যবস্থা করল। কিন্তু এই এত সব কিছুর মধ্যে তার

নারী হিসেবে অস্তিত্বটা কোথায় যেন শরীর এবং মন দুটোর কাছেই পরাজিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে! গহিন, অন্তর্লীন নারীত্ব তার জীবনের কোথাও আর কোনও পদধ্বনি তোলে না। তার জীবনে না আছে কোনও প্রেমের ভূমিকা, না আছে শরীরের ভূমিকা। সে প্যাট-প্যাট করে তাকায় লোকজনদের দিকে, কুটিল চাউনি দেয়, অবজ্ঞার চোখে তাকায়, ঠাট্টার, ব্যঙ্গের চোখে তাকায়, ভর্ৎসনার কিংবা রাগের চোখে তাকায়। কিন্তু প্রেমের দৃষ্টি সে কারও দিকে নিক্ষেপ করেনি বহু বছর। সে বিশাল বপুখানা নিয়ে হেঁটে চলে বেড়ায়। কিন্তু সেই সফরঘরের মধ্যে কোনও তরঙ্গ নেই, উত্তরোল নেই, ঢেউ নেই। সেই চলাচল অনেকটা জাহাজের কন্টেনারের ক্রেনে করে ওঠানামার মতো। একটু বেসামাল হওয়ার জো নেই।

এপাড়ায় দুটো লালু আছে, একটা ঢ্যাঙা লালু, একটা রোগা লালু। রোগা লালু আয়েষাকে ধরতে আয়েষার কোনও হেলদোল হল না। সে বলল, "ও লালু, কমলকে ডাক। আমার মনে হয় প্রেশার বেড়ে গেছে ইট করে।" আয়েষা আবার ধপ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

বাঁধুলির জ্বর ছাড়তে-ছাড়তে, আয়েষার শরীরে বল ফিরে আসতে-আসতে মাঝে তিন-চারদিন কেটে গেল। কমল রোজই এল গেল, আড্ডা দিল। কিন্তু আয়েষার আর কমলকে সোহিনী-শাঁটুলের কথাটা বলে ওঠা হল না।

পয়লা বৈশাখের দিন আয়েষা বাড়িতে একটা গেট টুগেদার করে। যাকে পারে, যাকে রাস্তায় দেখে মনে হয় ডাকি, তাকেই ডাকে, আহ্বান জানায় ছাদের সেই গেট টুগেদারে আসতে। তা ছাড়া এপাড়ার অনেকেই আছে ডাকলেই আসে। এমনকী, না ডাকলেও চলে আসে এবাড়ির উৎসব অনুষ্ঠানে।

কমল আর সোহিনীর তো এমনিই নেমন্তন্ন। এবার কমল আর সোহিনী চুকতেই আয়েষার জিভ সুলুক-সুলুক করতে লাগল। সে অমনই টের পেল, কীসের একটা খুঁতখুঁনি চলছিল মনের মধ্যে ক'দিন ধরেই।

সে খুব ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল সোহিনীর দিকে। এত দিন সে সোহিনীকে 'তুমি-তুমি' করে কথা বলত, আজ একরকম 'আয়, আয়, সোহিনী, কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে,' বলে খুব প্রগলভ হয়ে পড়ল আয়েষা। শাঁটুল এসেছে কি না চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল সে। নাঃ, এখনও আসেনি। এলে এমন কিছু করতে হবে যে, রগড় হবে খুব! মনে-মনে ভাবল সে। কী করা যায়? কী করা যায়? এমন কিছু করতে হবে যে, কমলের বউ কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি যাবে। আয়েষা কখনও চায় না কমল বউকে ত্যাগ করুক। সে ডিভোর্স-টিভোর্সের পক্ষপাতী নয়। আরে, ডিভোর্স হয়ে গেলে তো হয়েই গেল। ভাঙাভাঙির মধ্যে কোনও রস নেই। আকচাআকচিতে রস, গোপন কর্ম তো রসে থই-থই! কেচ্ছা কেলেঙ্কারি ছাড়া জীবনে উপভোগ করার মতো আর আছেটা কি? উফ, পাড়ার অন্যতম বর্ধিষ্ণু পরিবারের ইলিশে এম এ বউ, পাড়ার হায়ার সেকেন্ডারি পাশ বাড়ির দালালের সঙ্গে প্রেম করছে!

ঠিক এই সময় ছাদে উঠে এল শাঁটুল। শাঁটুলকে দেখে আয়েষার কটা-কটা চোখ দুটো রহস্যের সন্ধানে গনগনে হয়ে উঠল যেন! ফুলো-ফুলো হাতের গোল-গোল আঙুল পট-পট করে মটকে ফেলল উৎসাহে। শাঁটুলটা এমনি আর যাই হোক, চেহারাটা বেশ হিরো-হিরো! আজকাল জামাকাপড়ও বেশ বেছে-বেছে পরছে। হাতে সোনার চেন পরেছে। চুল-টুল সব সময় শ্যাম্পু করা। ফ্র্যাট, বাড়ির দালালি করে বেশ ভালই ইনকাম করছে শাঁটুল এখন। সেদিনই তো অভীক তার সঙ্গে গাড়িতে যেতে-যেতে মোবাইলে বলছিল শাঁটুলকে, 'তুই বিশ্বাসদের বাড়িটা আমাকে করিয়ে দে। দেড় কোটির মধ্যে টু পার্সেন্টের জায়গায় থ্রি পার্সেন্ট আমি তোকে দেব। আর যাই করিস শাঁটুল, মেড়োগুলোকে নর্থে আর ঢুকতে দিস না। ওরা এখন কলেজ স্ট্রিট অবধি চলে এসেছে। এবার শ্যামবাজার, বাগবাজারও ওদের গ্রাসে চলে যাবে। বাঙালির সঙ্গে ব্যবসা কর শাঁটুল, বাঙালির সঙ্গে।' দেড় কোটির থ্রি পার্সেন্ট প্রায় চার সাড়ে চার লাখ টাকা! আয়েষার একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে, অন্য কেউ অনেক টাকা রোজগার করছে শুনলেই সে কেমন আঁতকে ওঠে! নিজেদের ক্ষেত্রে হলে এই টাকাটাই তার মনে হত খোলামকুচি! আসলে আয়েষার জগৎটা খুব বড় নয়, এই বি টি রোডের হেমন্ত সেতুর ডান হাতে পড়ে থাকা বেশ একটা বড়সড় সাইজের ভূখণ্ডের মধ্যেই তার জগৎটা আটকে। এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে সে খুব একটা স্বচ্ছন্দ নয়। আর এইটুকুর মধ্যেই প্রভাব-প্রতিপত্তির যে আস্বাদ পেয়েছে, তা ধরে রাখতে সে সদা সতর্ক।

ফোনের কথোপকথন শুনে সে অবাক হয়ে অভীককে জিজ্ঞেস করেছিল, "শাঁটুল আজকাল এত বড়-বড় ডিল করছে?" অভীক সেদিন ব্যাধ হয়ে তার সহ-সওয়ারি হয়েছিল গাড়িতে। তার প্রশ্নের কোনও উত্তরই দিল না অভীক! সে যদি আবার প্রশ্ন করত তা হলে অবধারিতভাবে শুনতে হত, 'নিজের চরকায় তেল দাও!' অভীক তার প্রতি আজকাল নির্দয় হয়ে উঠেছে এবং তাতে বয়েই গেছে আয়েষার!

শাঁটুলকে তার ছোট মেয়ে বাঁধুলি খুব পছন্দ করে। সেদিন বেলাতে বাঁধুলি ছুটে এল, শাঁটুল খুব ভাল মিমিক্রি করে বম্বের সিনেমা আর্টিস্টদের। সেগুলো বার-বার দেখতে চায় বাঁধুলি। কিন্তু বাঁধুলি শাঁটুলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার আগেই আয়েষা শাঁটুলকে বলল, "অ্যাই শাঁটুল শোন এদিকে, কথা আছে!"

শাঁটুল আয়েষার এমন ঘনিষ্ঠ আহ্বানে অবাক হল কিঞ্চিৎ! বাবা, আয়েষাদির তো আজ অন্য মুড। প্রথমে আয়েষা একটা কাজের কথা সেরে নিল শাঁটুলের সঙ্গে: "শোন, লাইব্রেরিটা কিন্তু উঠে যেতে দেওয়া চলবে না শাঁটুল। মকাইদারা যদি বাড়িটা প্রোমোটারকে দিয়ে দেয়, তা হলে জ্যোতিষ্মানদারই বা কী হবে? কোথায় যাবে মানুষটা?"

সকলেই জানে, শাঁটুল জ্যোতিষ্মানদাকে ভীষণ ভালবাসে। এদিকে এ পাড়ায় কোনও বাড়ি বিক্রি হলে বা প্রোমোটারি হলেও শাঁটুলের লাভের ব্যাপার থাকে। পার্টি আনতে পারলে সে ভাগ পায়। শাঁটুল খুব দমে যাওয়া গলায় বলল, "জ্যোতিষ্মানদার তো গলায় ক্যানসার ধরা পড়েছে, জানো তো?"

"আমি জানব না?" বলল আয়েষা।

একথা-সেকথা বলে আয়েষা একদম সোজাসুজি আক্রমণ করল শাঁটুলকে, "সোহিনীর সঙ্গে তো খুব ইশারায় প্রেম চলছে? বলিস তো আমি তোকে সাহায্য করতে পারি!"

শাঁটুল ঘাবড়াল না। এক মুখ হাসল, "প্রেম কেন হতে যাবে?"

"তা হলে?"

"ধুস! কী যে বলো না?"

"আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয় রে শাঁটুল!"

"তুমি তো সকলের সঙ্গেই প্রেম দ্যাখো! তোমার মেয়েরা বড় হচ্ছে, তুমি এখন ওদের দিকে খেয়াল রাখলে কাজে দেবে," শাঁটুল ভীষণ বুদ্ধিমান। সে আয়েষার ফাঁদে পা দিল না।

আয়েষার ভুরু কুঁচকে গেল। তার চোখ ঘুরতে লাগল শাঁটুলের মুখের উপর,

"সোজা কথা সোজা করে বল শাঁটুল! আমি যা বলি, সোজা বলি!"

"আমার বলার কী আছে? তোমার চোখ তো সব দিকে! তা বাঁধনের দিকেও মাঝেসাঝে খেয়াল কোরো!" শাঁটুল খেলে গেল।

কত কী ভাবছিল আয়েষা শাঁটুল-সোহিনীকে নিয়ে! হঠাৎ বাঁধনের কথা ওঠায় চিন্তাভাবনা সব তালগোল পাকিয়ে গেল তার। বাঁধন ছাদে নেই। সে হুণ্ডায়াপ করে নামল সেতলায়। বাঁধন সাজছিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। একটা লাল ঢাকাই পরেছে, সঙ্গে লাল ঘটি হাতা ব্লাউজ। ডালিয়াও খুব সেজেগুজে এসে বসে আছে, বাঁধনের মেক-আপ বক্স ঘাঁটছে। আয়েষা বাঁধনকে বেশ ধমক দিয়ে বলল, "উপরে চল। এত দেরি হচ্ছে কেন?"

বাঁধন বলল, "মা, আমি আর ডালিয়ামাসি একটু বাগবাজারে যাচ্ছি। ওপাড়ায় ফাংশন হচ্ছে। সোনু নিগম আসছে, বিশাল-শেখর কুলোলো সে নিজেই ভর্তুকি দেয়। পাড়ার বয়স্কদের অনেকেই অভিযোগ করে, অভীকের হাতে পড়ে পাড়ার সংস্কৃতির অনেক অবনতি হয়েছে! তা হয়েছে, হয়েছে। আয়েষা এসব গায়েই মাখেনি। অভীক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, অভীকের বউ হিসেবে তার কথাই খাটে। সে কোমর বেঁধে মাঠে নামে বলেই তো ক্লাবের পুজো প্রতি বছর পুরস্কার পায়, রক্তদান শিবির এত সফল হয়, কাঙালি ভোজন, কম্বল দান, দুঃস্থ শিশুদের পাঠ্য বই বিতরণ — এরকম নানা জনহিতকর কার্যকলাপ চলতেই থাকে। চ্যানেলে-চ্যানেলে নাম ওঠে পাড়ার। এসব সত্ত্বেও, তার এই ওরিয়েন্টেশন সত্ত্বেও আজ বাঁধনের কথায় গায়ে জ্বালা ধরে গেল আয়েষার। বলল, "টিভিতে দিন রাত এত সিনেমা আর্টিস্টদের দেখেও মন ভরছে না? কথায়-কথায় রাস্তায় বেরনো, কথায়-কথায় বাগবাজার যাওয়া! কেন, কী আছে বাগবাজারে? আর ডালিয়া তুই কী রে? অতিরিক্ত নিরীহ! এই আক্রমণের মানেই বুঝল না। উল্টে বলল, "আমি যাই, মা-ও ফোন করছে।"

কিঞ্চিৎ খুঁশ হল আয়েষার, "না, না, উপরে যা, খেয়ে যাবি। তোদের আজ আর বাগবাজার যাওয়ার দরকার নেই।"

"আমি পরে এসে খাব!" ততক্ষণে দু' চোখে জল চলে এসেছে ডালিয়ার। কাউকে কিচ্ছু বলার সুযোগ না দিয়েই চলে গেল সে।

বাঁধন কিছুক্ষণ মায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে একে-একে খুলে ফেলতে লাগল সাজসজ্জা। তারপর চুপ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

"তুই উপরে যাবি না?"

"না, তুমি চলে যাও এখান থেকে!"

"কী দোষের কথা বললাম শুনি?"

বাঁধন ১৬ পেরুতে মেয়ে, মোটেই আর ছোট নেই। বাঁধন বলল, "মা, এখনও তুমি যদি নিজেকে না সংশোধন করো, মানুষকে যখন তখন অপমান করা বন্ধ না করো, একদিন তোমাকে সবাই ছেড়ে চলে যাবে। কেউ তোমার পাশে থাকবে না। দাদু না, ঠাম্মি না, বাবা না, বোন না — কেউ তোমাকে ভালবাসবে না। একমাত্র আমিই তোমাকে ইগনোর করিনি। 'মা' বলে সব সময় মান্য করেছি, আজ তুমি ডালিয়াদির সঙ্গে যা করলে, তোমাকে আমি....তোমাকে আমিও আর ভালবাসব না।"

আয়েষা বলল, "খুব হয়েছে, খুব ডায়লগ দিচ্ছিস!"

বাঁধন বলল, "মা, প্লিজ লিভ মি অ্যালোন। উইল ইউ?"

আয়েষা বুঝল, মেয়ে যথার্থই রেগে গেছে। সে আর ঘাঁটাল না বাঁধনকে। আপাতত মেয়ের বেরনো আটকানো গিয়েছে এতেই ভীষণ খুশি হল সে। সে আবার ধপ-ধপ করে উঠতে লাগল ছাদে। শাঁটুল লক্ষ করেছে, তার কথা শুনেই আয়েষাদি তরতর করে নীচে নেমে গেল। আর এখানে থাকবে না মনস্থির করে ফেলল সে। থাকলে ভালই হত! সোহিনী সাউথকে কাছ থেকে দেখা যেত ভাল করে। চন্দন রঙের একটা তাঁতের শাড়িতে যা দেখাচ্ছে! ব্লাউজের পিঠটা গভীর করে কাটা। সাদা পিঠটা তোলপাড় তুলবে যে-কোনও পুরুষের মনে। পিঠে লম্বালম্বি একটা খাঁজ। সেই খাঁজে শাঁটুল নাক ঘষল মনে-মনে। তারপর চোঁ-চোঁ করে দুটো হুইস্কি মেরে দিয়ে সে সোজা গিয়ে দাঁড়াল সোহিনীর সামনে। মেয়েটা তখন দলছুটের মতো ছাদের এক কোনায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার ব্রিজের দিকে তাকিয়ে আছে উদাস চোখে।

আয়েষা বুঝল, মেয়ে রেগে গেছে। তাই ঘাঁটাল না। মেয়ের বেরনো আটকানো গিয়েছে এতেই খুশি সে।

আসবে, বিশ্বালকে আমার অসাধারণ লাগে...আর দেব-ও আসছে। মাইকে অ্যানাউন্স করেছে!"

বাঁধন একদম তার মতোই হয়েছে। তার তো সারা জীবন কেটেছে জিতেন্দ্র-জয়াপ্রদা, মিঠুন-মাধুরী করে' তারা কী খায়, কী মাখে, কে কার সঙ্গে প্রেম করছে, সে অতি অধ্যবসায়ের সঙ্গে এর পাঠ নিয়েছে বাঁধনের চেয়ে ছোট বয়স থেকে। এমনকী, মেয়েদেরও সে কখনও কোনও কবিতা মুখস্থ করে শোনাতে বলেনি, বলেছে, "ওই গানটা গা তো, 'দিল তো পাগল হ্যায়, দিল দিওয়ানা হ্যায়।" বলেছে, "তুম মচা দে, 'ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর' নাচটা নাচতে। সে কত বার ভেবেছে, চ্যানেলে-চ্যানেলে ডান্স কম্পিটিশনে নাম দিলে মেয়ে তার নেচে ফাটিয়ে দিত! তারই উদ্যোগে পাড়ার বাৎসরিক ফাংশনে বঙ্গের স্টার কেউ না-কেউ আসেই। ক্লাবের টাকায় না তোর না হয় পড়াশোনার পাট চুকে গেছে, ওর তো তা নয়। বল?"

এমনিতেই আয়েষার গোপন রাগ ছিল ডালিয়ার প্রতি ক'দিন যাবৎ, একদিন ভানু এসেছে আর ডালিয়া রোজ ভানুদির গল্প করছে, ভানুদির নাকি ফিগারটা লাজবাব আছে, ভানুদির বর নাকি ভানুদিকে ভাত-টাত খেতেই দেয় না, বউয়ের দিকে ভীষণ নজর...আয়েষার আবার ফিগার ভাল মেয়েদের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ। আজ এই সুযোগে সে ডালিয়ার প্রতিও বিশেষ কঠোর হয়ে উঠল। সে বলল, "ডালিয়া তোর উচিত তোর বয়সি মেয়েদের সঙ্গে মেশা।"

বাঁধন খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "মা এটা ঠিক নয়, তুমি ডালিয়া মাসিকে এরকম করে কথা বলবে না খবরদার! তুমি পাড়ায় যাদের সঙ্গে মেশো, রকে বসে আড্ডা দাও, তারা সব তোমার বয়সি?"

ডালিয়া ব্যঙ্গার মতো হাসল। মেয়েটা

আশেপাশে কেউ নেই। শটিল সামনে দাঁড়িয়ে বিল্বমাত্র ভণিতা না করে বলল, "শোনো, আয়েষাদির সম্পর্কে একটু সাবধানে থেকো।"

॥ ৭ ॥

বছরের এই সময়টায় শর্মিলাদের অফিসে নিশ্বাস নেওয়ার ফুরসত থাকে না। এমনিতেই গত কয়েক বছর ধরে সে দেখছে, সামার টাইমে তুলনামূলক ঠান্ডার জায়গায় যাওয়াটা কলকাতার উচ্চবিত্তদের মধ্যে একটা রেওয়াজ হয়েই দাঁড়িয়েছে। সে স্বদেশ হোক বা বিদেশ। গরম পড়লে লোকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ছে। মে-জুন মাসে চাপ সবচেয়ে বেশি। আগে যেমন অবাঙালি ব্যবসাদাররাই অধিক সংখ্যায় বিদেশভ্রমণ করত, পছন্দের জায়গা ছিল ইউরোপ। এখন বাঙালি চাকুরিজীবীরাও দিব্যি তিন-চার লক্ষ টাকা খরচ করে ঘুরতে চলে যাচ্ছে এসব জায়গায়। আজই যেমন, সে গুণে দেখল, ২২টা ভিসা অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে তাদের, যারা বাঙালি এবং চাকরি করে। লাঞ্চ ব্রেক নেওয়ার আগেই শর্মিলা নবাবকেকে বুঝিয়ে দিল কাল ভোর-ভোর ওকে ইউ কে-র ভিসা অফিসে পৌঁছে যেতে হবে। জমা সাতের তো কালই ভিসা ইন্টারভিউ। নবাবকে ছেলেটা নতুন জয়েন করেছে, কিন্তু বেশ করিৎকর্মা। রেবাদি প্লেট-টেট ধুয়ে রেখে গেছে। শর্মিলা ওয়াশ রুম থেকে মুখ-টুখ ধুয়ে এসে সবে লাঞ্চ বক্স খুলবে, আদিত্যর ফোন।

"শর্মিলা, কথা বলা যাবে?"

"হ্যাঁ বলো।"

"আজ মিমির বাড়ি থেকে সবাই সল্টলেকে আসছে।"

"মিমি কে?"

"সিউড়ির ওই মেয়েটি, ওর ডাকনাম মিমি।"

মেয়েটার ভাল নাম লিচ্ছবী। কী নামের ঘটা! কিন্তু শর্মিলা অবাক হল এই ভেবে যে, আদিত্য হবু ছেলের বউকে ডাকনামে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে? শর্মিলা যত দূর জানে, এই লিচ্ছবী মেয়েটা কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করে এবং মেয়েটি যথেষ্ট স্বাধীনচেতা। সিউড়িতে পরিবারের বিরাট ব্যবসা। ওখানে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সও খুব ভাল। একটা-দুটো নয়, কলকাতায় অনেকগুলো বাড়ি-টাড়ি আছে মেয়ের বাবার, তারই একটায় মেয়েটি একা-একা থাকে। ও লেডি রেবোর্নে পড়ে। আদিত্যর এই রকম মেয়েই পছন্দ ছেলের জন্য। যতই লন্ডনে পড়াশোনা করে আসুক না কেন, মহুল বেশ ইন্ট্রোভার্ট। বেশি কথা বলে না, খুব একটা বন্ধু-বান্ধব নেই, আদিত্য তো রাজারহাটে একটা বড় ফ্ল্যাট এই জন্যই কিনে দিল ছেলেকে যে মহুল বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পার্টি করবে, গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ফুর্তি করবে। কিন্তু মহুলের দুটো-একটা ছাড়া বন্ধু নেই, লন্ডনে ওর সঙ্গে একটা চাইনিজ মেয়ের প্রেম হয়েছিল, ইন্ডিয়াতে ফিরে আসার পর সেটা কেটে যায়। এখন মহুলের কোনও বান্ধবী আছে কি না সন্দেহ আদিত্যর। সে বলেছিল, "এ কী ছেলে হল রে বাবা! ২৫ বছর বয়স অথচ একটা মেয়েবন্ধু নেই?" শর্মিলা শুনে বলেছিল, "আচ্ছা, তুমি ওকে পুশ করছ কেন? যখন হওয়ার হবে, ছোট থেকে লন্ডনে থেকেছে। এখানকার মেয়েদের ওর অতটা ভাল না-ও লাগতে পারে।" আদিত্য বলেছিল, "ওর বয়সে আমার ২২টা গার্লফ্রেন্ড ছিল! আর তারা সব কী জিনিস ছিল! এক সে বড় কর এ-ক! অল্পপূর্ণা বলে একটা পঞ্জাবি মেয়ে ছিল, তাকে সামলাতে দশটা মিলিটারি কম পড়বে, সেই মেয়ে আমার পিছনে ঘুরত! সেই আমার ছেলের এই অবস্থা? রাত আটটায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বাংলা নিউজ শুনছে? ছোঃ! এ জিনিসকে ঠিক করতে হবে। যে বয়সের যা, সেটা যদি না করে, পরে উল্টোপাল্টা করে বেড়াবে! লাইফ নষ্ট করবে। মেয়ে-ফেয়ে এখনই এন্জার ঘেঁটে নেওয়া উচিত। নইলে পরে কাজের মেয়ে ঘর মুছলেও তার পাছার দিকে তাকিয়ে থাকবে, বুঝেছ?" শর্মিলা হেসে ফেলত। তার রাগও হত এসব শুনে। অল্পপূর্ণার গল্প শুনে-শুনে তো কান পচে গেছে। কে যে কার পিছনে ঘুরত! তারপরই সে সিরিয়াস হয়ে যায়, "এত মেয়েদের সঙ্গে মিশে, এত লীলাখেলা করে তারপর তুমি পরমাদিকে বিয়ে করেছিলে। আর সেই বিয়েটা ওয়র্ক করল না?" এসব কথা হাজার বার হয়ে গেছে। তবু বারবার হতে থাকে। আদিত্যর সঙ্গে প্রেম পর্বেও সে এই প্রশ্ন করত। আগে এই প্রশ্নের জবাবে আদিত্য খুব উদার ভাবে বলত, "দোষও তো তোমার! তুমি আমার মাথা ঘোরানোর জন্য এলে কেন?" এখন আদিত্য এই প্রশ্নের জবাবে চুপ করে থাকে কিংবা বলে, "ছাড়ো তো, তোমাদের মেয়েদের শুধু পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা!" তা ছাড়া এই সময়ের মধ্যে আদিত্যর সবচেয়ে বড় পরিবর্তন যেটা দেখা দিয়েছে সেটা হল, ছেলে-ছেলে করে চিন্তা করা। আর শর্মিলার মনে হয়, ছেলে-ছেলে করেই আদিত্য তার কাছ থেকে ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে আবার ফিরে যাচ্ছে পরিবারের মধ্যে, যেখানে পরমাও আছে!

ফোনে আদিত্যর কথা শুনে শর্মিলা হেসে ফেলে বলল, "বাবা, হবু পুত্রবধূকে একদম 'মিমি' বলে ডাকতে শুরু করে দিলেন?" সে 'আপনি'তে ফিরে গেল। চেতনার মধ্যে সামান্য দ্বিধা এলেই সে 'আপনি'তে সরে যায়।

"তোমার ভ্যানতাদা রাখো তো। যেটা বলছি সেটা শোনো, আজ মিমির বাড়ির লোকেরা আসবে, আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে যাব সল্টলেক। আমার ফিরতে রাত হবে, কত রাত জানি না। তুমি মেয়ে নিও। আমি খেয়ে আসব। হল?"

"বাস, আর কী?" বলল সে, "তা আজই কি আশীর্বাদ?"

"এত তাড়াতাড়ি আশীর্বাদ? আমার ছেলের আশীর্বাদ হলে সারা শহর জানতে পারবে। সেটা একটা বড় প্রিপারেশন, আমার সঙ্গে এত বছর থেকেও তুমি কিছুই বুঝলে না। মনটা সেই অনাদি ঘোষাল স্টিটের মতোই রেখে দিয়েছ!" কল্পনার সঙ্গে হাসল আদিত্য।

তার রাগ চরমে উঠছিল। আজ তার মনে পরমা আর আদিত্য মহুলের দায়িত্বশীল বাবা-মা'র ভূমিকা পালন করবে কতগুলো লোকের সামনে। আর তারা নিশ্চয়ই ওদের স্বামী-স্ত্রীর মতোই ট্রিট করবে। এই সামাজিকতার নামে ওরা বেশ গ্রহণযোগ্য স্বামী-স্ত্রীই হয়ে উঠতে চাইবে নিশ্চয়ই। ভাঙন, বিচ্ছেদ, টেনশন, এসব কিছুই উঠে আসবে না! বাবা, কী ভাল নাটক! সমাজ আর সামাজিকতার খাতিরে, ছেলের ভালর জন্য যদি এসবই চলবে, ডিভোর্সড হাজ্‌ব্যান্ড-ওয়াইফ এত সময় পরস্পরের সঙ্গই করবে যদি, তা হলে কী দরকার ছিল বিয়েটা ভাঙার এবং তাকে বিয়ে করার? শর্মিলা তো ওখানে আনওয়ান্টেড। আজকের সন্ধ্যায় যদি শর্মিলা উপস্থিত হয়, তা হলেই তো চিত্তির! সব স্বাভাবিকতা মার খেয়ে যাবে। এভাবে চলতে থাকলে তো অচিরেই আদিত্যর জীবনে সে অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। সে কি এমন ট্রয়ের হেলেন যে, এত ঝকমারি করে শুধু রাতটুকু একসঙ্গে ঘুমনোর জন্য আদিত্য বাইপাসের ফ্ল্যাটে ফিরবে? একসঙ্গে ছ' বছর থাকার পর শরীরের উদ্দামতা তো অনেকটাই কেটে গেছে আদিত্যর। শর্মিলা আজকাল ভীষণ ভাবে ফিল করে ধর্মসম্মত স্ত্রী সে নয়, আজও পরমাই রয়ে গেছে। যখন সে ভাবে, আদিত্য পরমাকে ডিভোর্সের কাগজে সই

করতে বলেছিল আর পরমা সই করে দিয়েছিল নির্বিকারভাবে, তখন তার আরও রাগ হয়। পরমা যেন করুণাই করেছিল তাকে! তখন তার মনে হয়। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী ভাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং! হায়, সে নিজেই ওদের স্বামী-স্ত্রী ভাবে। আজও রাগটা উঠে এলেও সে গিলে ফেলল। বলল, "ঠিক আছে, খেয়ে নেব!"

"দরকার পড়লে ফোন কোরো!" বলল আদিত্য।

তার মানে অবরকারে ফোন কোরো না! ফোন ছেড়ে দু'-একবার কড়-বড় করে নিশ্বাস নিল সে। আদিত্য এটা ঠিক করছে না। আদিত্য নিজের সুবিধেমতো জীবনটাকে দু'টো ভাগে ভাগ করে নিয়ে বাঁচছে! এই দু'টো জীবন আলাদা, এই দু'টো জীবনে আদিত্যর দু'টো মুখ, দু'টো পার্সোনালিটি। আর সে এখানে প্রায়...শর্মিলা চোখ বন্ধ করে মাথাটা এলিয়ে দিল চেয়ারে, প্রায়...তার চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল, উল্টো মুখো শুয়ে গেল না। নিজেকে প্রায় 'রক্ষিতা'র মতো ভেবে ফেলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সে!

তারপর সে হঠাৎ আবিষ্কার করল, সে ভাবতে পারছে! ক্রমশ সে আবার নিজের মতো করে অনেক কিছু ভাবতে পারছে। বোধ হয় আদিত্যর ছায়া থেকে একটু সরে দাঁড়িয়েছে বলেই। আর খুব দ্রুত ভেবেও ফেলল শর্মিলা, আজ সে কিছু না হোক রাত আটটা-ন'টা অবধি ফ্রি। চাইলে রাত দশটা অবধি বাইরে থাকতে পারে। তখনই সে ঠিক করল, আজ একবার অনাদি ঘোষাল স্ট্রিটে গেলে হয় না? সেদিন গায়ত্রী-ডালিয়া, দু'জনেই বলছিল, জ্যোতিষ্মানন্দার ক্যান্সার ধরা পড়েছে গলায়। একটা সময় সে রোজ স্কুল থেকে ফিরে লাইব্রেরিতে যেত, গিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসে বই পড়ত। আর জ্যোতিষ্মানন্দা, আধ-ঘেপাটে জ্যোতিষ্মান দত্ত একমাত্র তার সঙ্গেই বসে-বসে গল্প করত। কত গল্প যে হত তাদের! তার বই পড়ার অভ্যেসটা একদম চলে গেল কী করে! মনটা ভীষণ আর্দ্র হয়ে উঠল তার। তাড়াতাড়ি যদি বেরতে পারে, তা হলে পৌঁছে দেখবে লাইব্রেরির ঘরে নীল-নীল টিউব জ্বলছে। বিরাট-বিরাট সব স্টিলের বুক র‍্যাক। অলিভ গ্রিন রং করা। তার কাচের ভিতর ঘরে-ঘরে বই। বইগুলো ভীষণ পুরনো। অধিকাংশই খুব ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। ওই বইগুলো এখন আর কেউ-ই খুব একটা পড়ে না। কিন্তু ওই বইগুলোর গায়ে-গায়ে তাদের ওই পাড়া, আশেপাশের পাড়ার কত মানুষের হাতের স্পর্শ। যদি কোনওদিন কোনও ফরেনসিক অনুসন্ধান হয়, হাজার-হাজার মানুষের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে বইগুলোতে। আর জ্যোতিষ্মানন্দাই ওই বইগুলোর প্রহরী! জ্যোতিষ্মানন্দাই ওই বইগুলো সকলের হাতে-হাতে তুলে দেয়। দু'টো মুখোমুখি র‍্যাকের মাঝখানে দেড় ফুটের চওড়া সুড়ঙ্গ। রংচটা পাঞ্জাবি পরা লোকটা ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে চোখ বন্ধ করেও যে-কোনও বই এনে দিতে পারে। আজ সে জ্যোতিষ্মানন্দাকে গিয়ে বলবে, 'আমাকে নতুন করে মেম্বারশিপ দাও।'

ডালিয়া সেদিন বলছিল, ক্যান্সার তো কী? ঠিক সাড়ে চারটের সময় লাইব্রেরির দরজা খোলে জ্যোতিষ্মানন্দা। ঝাঁট দেয়, জল ছেটায়। রাত দশটা অবধি বসে থাকে। ফাঁকা লাইব্রেরি, এখন তো কেউই সেভাবে বই পড়ে না। আর সবচেয়ে বড় কথা মকাইলারা বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চায় প্রোমোটারকে।

॥ ৮ ॥

দেড় মাসের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয় বার পাড়ায় এল শর্মিলা। একটু কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে? ছ' বছর এল না, তারপর এত ঘন-ঘন? গতবারই গায়ত্রী তাকে একবার জিজ্ঞেস করেছে, "ভানু তোর ওদিকে কি গন্ডগোল হচ্ছে? দেখিস! ভয় করে!"

ভয় কি তারও হচ্ছে না? কিন্তু কত আর ভয় পাবে? সে যে ভিতরে-ভিতরে বড্ড একা হয়ে গেছে। আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, সংসারটা ঠিক সংসার নয়। বৈধ স্বামীর কাছে সে যেন ঠিক স্ত্রী নয়, কোথায় যাবে তা হলে সে?

গাড়িটা বিরাট বড়, বিদেশি। আজ এই ব্যাপারেও সে বেশ সাহস দেখিয়ে ফেলল। তাকে অফিস থেকে আজ অন্য ড্রাইভার নিতে এসেছে। সেটাই সুবিধে। হরিন্দর, বিহারি ছেলে। এর সঙ্গে আদিত্যর অত কথা হয় না। এত বড় গাড়ি বাই লেনে ঢুকবে না। ফলে মোহিনী মোহন লেনে ঢোকার মুখে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল শর্মিলা। আর ঠিক তখনই অভীক বেরিয়ে এল ওদের বাড়ির ফটক খুলে। ঘুমিয়ে টুমিয়ে চোখ-মুখ ফুল গেছে অভীকের। মদ খেয়ে-খেয়ে একেই তো চোখের তলায় পাউচ। শ্যাম গাত্রবর্ণে লালের প্রলেপ। ৪২-৪৩ বছরের অভীককে দেখাচ্ছে একদম বিশ্বম্ভর ঘোষের মতো! একটা কারুকার্য খচিত পাঞ্জাবি গায়ে, সাদা চটি। গায়ত্রী বলছিল, সেভাবে ব্যবসা-ট্যাবসা দেখেই না অভীক আজকাল। এই একটা ব্যবসা করছে, দু'দিন না যেতেই সেটা তুলে দিচ্ছে। প্রোমোটারিটাই চলছে কোনওমতে। অভীকের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে শর্মিলা ভেবে পেল না কথা বলবে নাকি বলবে না।

অভীক তাকে ভুরু কুঁচকে দেখছে। যেন চিনতে-টিনতে পারছে না। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল, "ভানু, তুই?"

"হ্যাঁ অভীকদা।"

"অনেক বদলে গিয়েছিস। আয়েষা বলছিল, তুই পাড়ায় আসিস আজকাল। খবরটবর সব ভাল তো?"

সত্যি কথা বলতে, অনেক বড়লোকের ছেলে হলেও অভীকদা খুব ডাউন টু আর্থ চিরদিনই। একটা সময় খুব রটেছিল তার আর অভীকদার মধ্যে প্রেম চলছে। অভীকদাকে সে পছন্দ করত। প্রেমে কলাচ পড়েনি। তার কারণটা সম্পূর্ণ অন্য। তার খুব ইচ্ছে ছিল, একজন উচ্চশিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে তার। ব্যবসায়ী-ট্যাবসায়ী সে অত পাত্তা দিত না। ভাগ্যের ফের দেখো!

"খবর, ওই চলছে," মৃদু হেসে বলল শর্মিলা।

"শোন, তোদের বাড়িতে একদিন যেতাম আমি। আয়েষা ডালিয়ার সঙ্গে খুব খারাপ

দেড় মাসের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয় বার পাড়ায় এল শর্মিলা। একটু কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে?

ব্যবহার করেছে। খুব অন্যায়, খুব অন্যায়।"
"খারাপ ব্যবহার? ডালিয়ার সঙ্গে? কেন?"
"পয়লা বৈশাখের দিন মেয়েটা না খেয়ে চলে গেছে। আমি যাব। আয়েষা কেমন যেন হয়ে গেছে। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। কাজের লোক, ড্রাইভার, পাড়া-প্রতিবেশী, সকলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। পাড়ায় আমার বেরতে ভয় হয়। কে এসে বলবে আয়েষার এই দোষ হয়েছে।"
দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে বাই লেনের মুখে চলে এসেছে। অভীকদা একটু গলা নামিয়ে দিল, "এই রাধাদিরা, সলিলের বউ, আরও কয়েকজন আছে, যারা আয়েষাকে তোল্লাই দেয়। আয়েষা তাদের নিয়ে মাল্টিপ্লেক্সে যায়, রেস্তরাঁয় যায় আর তারা 'আয়েষা আমাদের নয়নের মণি' ভাব দেখায়! আয়েষা ভাবে, এরাই বোধ হয় পুরো পৃথিবী। তুই জানিস, আমি আয়েষার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখি না?"
সে বলল, "থাক না অভীকদা। ঘরে-ঘরে সব একই ব্যাপার। বাইরেটা সকলেই ঠিক রেখে চলে।"
"তোকে দেখে মনে হয় সুখী।"
"তা এক রকম।"
"এটা একটা উত্তর হল?"
"আমরা যে যার পথ বেছে নিয়েছি অভীকদা। তার দায় তো আমাদের উপরই বর্তায়।"
"তুই কি এখনও চাকরি করছিস?"
"হ্যাঁ।"
"কেন রে? মেয়েদের চাকরি করা আমি পছন্দ করি না। স্কুল টিচার, অধ্যাপিকা, এসব ঠিক আছে।"
"ওসব বললে চলবে? সংসারে মেয়েদের টাকার প্রয়োজন আছে।"
"তাও ভাল যে, তুই বললি না মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়োজন।"
"ওটা বাসি কথা। সকলেরই প্রয়োজন।"
হঠাৎ সে বলল, "অভীকদা, জ্যোতিষ্মানদার ক্যান্সার হয়েছে। কেউ তো নেই মানুষটার, কী করে চিকিৎসা হবে?"
অভীকদা এদিকওদিক তাকাল, "শোন, মকাইদের বাড়িটা আমি কেনার চেষ্টায় আছি। যদি কিনতে পারি, একতলায় একটা বুক স্টোর করব। সঙ্গে কফি শপ, লাইব্রেরিটাও থাকবে।"
"পাড়ার ভিতরে কফি শপ? চলবে? তার উপর এই আদ্যিকালের পাড়ায়?"
"নর্থ ক্যালকাটাকে একটু বদলাতে হবে বুঝলি?"
"তোমার ঠাকুরমার নামে বাসস্ট্যান্ডটা তো খুব সুন্দর হয়েছে!"
"গমের গুদামের ওখানে আমিই তো পাবলিক টয়লেট করালাম।"
"তুমি কি এবার ইলেকশনে দাঁড়াবে অভীকদা?"
গলির মুখে ঝিম ধরা সূর্যালোক, বিকেল শেষ। অভীকদা বলল, "দাঁড়াতেই পারি।"

গায়ত্রীর কাছে চা-টা খেয়ে সে যখন পাড়ায় বেরল, তখন কত লোকের সঙ্গে যে দেখা হল তার...সকলের সঙ্গে দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলে-বলে এগোতেই শর্মিলার এক ঘণ্টা লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত লাইব্রেরির দরজার সামনে পৌঁছে সে ডাকল, "জ্যোতিষ্মানদা?"
কাঁচা-পাকা এক রাশ দাড়ি, ঝাঁকড়া চুলের মানুষটা একটা জাবদা কাগজের কাটিং আঠা দিয়ে আটকাচ্ছিল। শর্মিলা দেখল, সেই রংচটা শত পুরনো পাঞ্জাবি। এপাড়ায় কে যে কার জেঠা, কে যে মামা আর কে যে সাত বুড়োটে হয়েও দাদা, তার কোনও সম্পর্ক সূত্র নেই। জ্যোতিষ্মানদা তো বয়সে ছোট মামার চেয়েও বড়। বড় মামার বন্ধু। বড় মামা অবশ্য খুব অল্প বয়সে ম্যালেরিয়া হয়ে মারা গিয়েছিল। শর্মিলার বড় মামাকে মনেই পড়ে না।
এপাড়ায় মুখে-মুখে অনেকের ইতিহাসই ঘোরে ফেরে। সবাই বলে জ্যোতিষ্মান

নকশাল ছিল। আসলে তা নয়। এই অনাদি ঘোষাল স্ট্রিটটা জ্যোতিষ্মান ঘোষালের খোদ ঠাকুরদার বাবার নামে। ঘোষালরা বনেদি লোক। জ্যোতিষ্মান পড়াশোনা করেছিল দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুলে। ছুটিছাটায় এলেও পাড়ার লোকজনদের সঙ্গে বেশি মিশত না। পারতও না মিশতে। জ্যোতিষ্মানের কাছে এপাড়ার লোকজন ছিল এলিয়েন! এ পাড়ার লোকদের কাছেও জ্যোতিষ্মান ছিল তাই। জ্যোতিষ্মানকে নিয়ে নানা মুখরোচক গল্প ছিল পাড়ায়। ছেলেটা নাকি নিউ মার্কেট থেকে শুয়োর কিনে এনে খায়! গোরুও খেয়েছে। সন্ধেবেলা একটু ব্র্যান্ডি পান না করলে ছেলের ঘুম আসে না! চাকরবাকরদের সঙ্গেও ইংলিশে কথা বলে! কাঁটা-চামচ দিয়ে ভাত খায়। অনেক অ্যাংলো মেয়েদের সঙ্গে ওঠা বসা আছে। ফলে এপাড়ার ছেলে হয়েও জ্যোতিষ্মানকে কেউ কখনও নিজের বলে ভাবতে পারেনি। এসব রটনার অনেকটাই সত্যিও ছিল। ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও জ্যোতিষ্মান নিজের ঘরের দেয়ালে যিশুর পোর্সেলিনের মূর্তি টাঙিয়েছিল। সকাল-সন্ধে মোমবাতি হাতে 'প্রে'ও করত। সেই জ্যোতিষ্মান কলকাতায় ফিরে ভর্তি হল প্রেসিডেন্সিতে।

জ্যোতিষ্মানের সঙ্গে কলকাতার সেই সময়ের বাস্তবতার কোনও যোগই ছিল না কোনও। সে তখন সন্ধেবেলা থিয়েটার রোডে আড্ডা দিতে যায়, পার্ক স্ট্রিটে মদ খায়। ব্রেকফাস্ট সারে হ্যাম দিয়ে। সিনে ক্লাবের মেম্বার। বাড়িতে গুচ্ছের বিদেশি গান শোনে, স্যাক্সোফোন বাজাতে চেষ্টা করে। তার তখন বছরখানেকের মধ্যেই বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা। সেই অবস্থায় একদিন মাঝরাতে পুলিশ এসে জ্যোতিষ্মান ঘোষালকে তুলে নিয়ে যায় ফ্রেজ নাম বিভ্রাটের কারণে!

অচিরেই পুলিশের ভুল ভাঙে। কিন্তু প্রোটোকলে আটকে জ্যোতিষ্মান ছাড়া পেতে-পেতে চলে যায় ২২টা মাস! ২২ মাস পরে ছাড়া পেয়ে সে যখন এপাড়ায় ফেরে, তখন তার খোলনলচে বদলে গেছে। কেউ জানে না, এই ২২ মাসের হিসেব। কিন্তু ধরেই নেওয়া যায়, ধরা পড়ার পর তাকে যথেষ্ট পুলিশি অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। কারণ, যে জ্যোতিষ্মান ঘোষালকে ধরতে চেয়েছিল পুলিশ সেই জ্যোতিষ্মান ঘোষাল লালবাজারের এক সিনিয়ার অফিসারকে সামনে থেকে গুলি করে মেরেছিল! ওই অফিসার তখন ভোরবেলা কুকুর নিয়ে মর্নিংওয়াক করতে বেরিয়েছিলেন।

একটা আধপাগল ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে এনে মহা মুশকিলে পড়েন জ্যোতিষ্মানের বাবা অর্ধেন্দু ঘোষাল। ছেলের মা নেই। শরিকি বাড়িতে রমণীর অভাব নেই, যুবতী বউরা, মেয়েরা। গ্যারাজটা খালি ছিল। সেখানে দেওয়াল তুলে দরজা বের করে দেওয়া হল। শিক বসানো একটা জানলা, জানলার লম্বালম্বি একটা খাট। জ্যোতিষ্মানের ঠাঁই হল সেই ঘরে। ভিতরের বাড়িতে আর কোনওদিন ফিরে যাওয়া হল না। একটু সুস্থ-স্বাভাবিক হওয়ার পর দেখা গেল জ্যোতিষ্মান দিনরাত বই পড়ে। ওটাই তার একমাত্র আশ্রয়। যেতে-আসতে সকলেই দেখে, জ্যোতিষ্মান শিক দেওয়া জানলার পাশে বসে বই পড়ে যাচ্ছে! এরও অনেক বছর পরে বাবার কাছে জ্যোতিষ্মান একটাই জিনিস চেয়েছিল, একটা লাইব্রেরি। গ্যারাজের পাশেই একটা বড়, লম্বা অংশ অব্যবহৃত পড়ে ছিল ঘোষাল বাড়িতে। অর্ধেন্দু ঘোষাল মৃত্যুর আগে এই লাইব্রেরিটা তৈরি করে দিয়ে গেলেন ছেলেকে। পরবর্তী সময়ে একটা গ্রান্টও পেয়ে গেল লাইব্রেরিটা, সরকারের কাছ থেকে। ৩০ বছর আগে বেশ রমরমাই ছিল 'কল্লোলিনী পাঠাগার'-এর। তখন মানুষ বই পড়ত। একটু বেলার দিকে আসত পাড়ার মেয়ে-বউরা। বিকেলে ভিড় জমাত পাড়ার অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা। অফিসফেরত বাবুরা আসত খবরের কাগজ পড়তে। মেম্বারশিপ ফি ছিল তিন টাকা মাসে। জ্যোতিষ্মান একটা জীবন পেল। খুব একটা কথাবার্তায় যেত না, কিন্তু মানুষের উত্তাপের মধ্যে তো থাকত। এখন বছর সাত-আট হল সকালে লাইব্রেরি আর খোলা হয় না। বিকেলেও শুধু কিছু কিপটে বুড়োর দল জড়ো হয় খবরের কাগজ পড়তে। এ ছাড়া সারাদিন চারটে বইও ছাড়তে হয় না জ্যোতিষ্মানকে। গত দু' বছরে মাত্র সাতটা নতুন মেম্বারশিপ হয়েছে। চাঁদা বেড়ে-বেড়ে হয়েছে মাসে ১৭ টাকা। অনেক সভ্যর চাঁদাই বছরের পর বছর বাকি রয়ে গেছে।

জ্যোতিষ্মানদা তাকাল মুখ তুলে। খুব কষ্ট করে একটা ঢোক গিলে বলতে গেল, "তুই? কত দিন পরে এলি ভানু!" কিন্তু কথাগুলো কেমন ফ্যাসফ্যাসে শোনাল শর্মিলার কানে।

"হ্যাঁ, জ্যোতিষ্মানদা, তোমার খবর নিতে এলাম।"

"আয় বোস," সেই এক ফাঁসা গলা। একটা কাঠের চেয়ার দেখিয়ে দিল জ্যোতিষ্মান।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকল দু'জনের মুখের দিকে। সে ভাবল আজ এক ফাঁকে সে বলে যাবে, 'জ্যোতিষ্মানদা, তুমিই কিন্তু আমার প্রথম প্রেম,' শর্মিলার বোধ হয় বাপের বয়সি লোকেদের প্রেমে পড়ার একটা বাতিক ছিল অল্প বয়স থেকে। খুব ছোটবেলায় বাবা মারা গেলেই কি এমনটা হয়? হাতের আঙুল দিয়ে জ্যোতিষ্মান একটা মুদ্রা করল, যার মানে অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু শর্মিলার মনে হল, 'আর কী!'

সে বলল, "তুমি ভীষণ রোগা হয়ে গেছ জ্যোতিষ্মানদা। তোমাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছে।"

জ্যোতিষ্মানদা বলল, "খেতে পারি না। গলায় ব্যথা।"

এত গরমেও জ্যোতিষ্মানদার গলায় একটা মাফলার জড়ানো। সে বলল, "এটা দিয়ে রেখেছ কেন?"

"আরাম হয়।"

"খুব কষ্ট পাচ্ছ?"

জ্যোতিষ্মান মাথা নাড়ল, "নাঃ, বেড়ে আছি। দিন ফুরিয়ে এল। ভানু, আমার কথা বলতে কষ্ট হয়। আর প্রশ্ন করিস না। বরং তুই বল যা খুশি। আমি শুনি।"

হঠাৎ তার সেই দাদুর প্রশ্ন করার ভঙ্গিটা মনে পড়ে গেল। সে মনে-মনে বলল, 'তুমি হয়তো ভাবছ, আমি বিয়ে করে চলে গিয়েছিলাম আর আসতাম না। তা হলে হঠাৎ আবার এসেছি কেন? একটা টান রয়েই গেছে গো জ্যোতিষ্মানদা!

মামাবাড়িতে মানুষ হয়েছিলাম, তখন বেশ অনটনের সংসার, বাড়িভাড়াটে, নিজস্ব একটু সময়ের বড় অকুলান ছিল। প্রাইভেসি ছিল না। বন্ধুদের আনতে পারতাম না। দাদুর ঘরে বসে পড়তাম, দাদুকে কথায়-কথায় কফ ফেলার ডাবর এগিয়ে দিতে হত। মামিও তখন খুব কথা শোনাত। সব মিলিয়ে ভাল লাগত না। মনে হত, কীভাবে মুক্তি পাব। পড়াশোনা করতাম খুব। চাকরি করব বড়, ফ্ল্যাট কিনব, হাত-পা ছড়িয়ে থাকব, যা ইচ্ছে হয় খাব, নিজে নিয়ে খাব, তিন পিস-চার পিস মাছ খাব একসঙ্গে! বাথরুমে আয়না থাকবে। বিছানার পাশে বেডসাইড ল্যাম্প জ্বেলে থ্রিলার পড়ব, একা-একা গান শুনে কাঁদব, এই রকম কাঁচা ইচ্ছে ছিল! ঠিকই এগোচ্ছিল সব, কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল জ্যোতিষ্মানদা। বিবাহিত পুরুষের প্রেমে পড়লাম। শুধু প্রেম হলে অসুবিধে ছিল না। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে প্রেম করলে না অবধারিতভাবে ওই ইগো প্রবলেমটা চলে আসে, আমি না সে? পুরুষ কাকে বেছে নেবে? প্রেম কতটা

নিষাদ? কতটা মরিয়া? মুখে বললে তো হবে না, প্রমাণ চাই, প্রমাণ ঘর ভাঙো। তবু বিশ্বাস করো, আমি ওকে ঘর ভাঙতে বলিনি। ওই-ই এগিয়ে গিয়ে করল সেটা। আসলে বড় বিজনেসম্যান তো, ও জানত, দু' কিশই রাখতে গেলে প্রথমে ভাঙতে হবে, তারপর আবার জোড়া লাগাতে হবে। ছ' বছর পর এই ছবিটা খুব পরিষ্কার। এখন আমার বেডরুমে বিছানার পাশে পোর্সেলিনের ল্যাম্পশেড, এখন ক্রমশ চুপ মেরে গেলে আদিত্য আমাকে সঙ্গ দিতে বালি দ্বীপে নিয়ে যায়, মায়ামি নিয়ে যায়। গতবার আমার জন্মদিন পালিত হল টোকিওতে। এখন আমাকে উজ্জীবিত করতে উইক এন্ডে আদিত্য আমার সঙ্গে রান্নাঘরে ঢোকে। চিঞ্চ দেওয়া বেকড ইলিশ মাছ বানায়, আমি খেতে পারি না। তা ছাড়া এক টুকরোর বেশি আমার খাওয়ার অধিকার নেই। আমি যে কী পেয়েছি, আমি নিজেই ঠিক জানি না জ্যোতিষ্মানদা! আমার সুখও নেই, অসুখও নেই। আমার গুরুত্বও নেই, আমি নেগোলেক্টেডও নই। আমার প্রয়োজনও নেই, অপ্রয়োজনীয়ও নই। আমার ফ্লাটটা কী সাজানো, কিন্তু সেখানে আমি বড় সন্তর্পণে থাকি! আদিত্যর নিয়মের বাইরে আমার একটা পা-ও পাতার উপায় নেই! কী হল আমার সেই মুক্তির জ্যোতিষ্মানদা? একটু-একটু করে আদিত্য ওর পরিবারের কাছে ফিরে যাচ্ছে। এখন হয়তো কিছুটা ঢাকা চাপা আছে, এর পর আর তাও থাকবে না। আমাদের ২৮ তলার আস্তানাটা কী বলো তো? ভুঁইফোড়! সল্টলেকের বাড়িতে কখনও যাইনি। সেখানে সকালে আদিত্যর বাবা-মা বারান্দায় বসে চা খায়, সেখানে আদিত্যর পরিবারের সবাই আসছে-যাচ্ছে। চার মামা, চার মামি, ছেলেপুলে, মাসি, মাসতুতো বোনেরা, পিসিরা, পিসতুতো দুই ভাই, তাদের বউরা, পরমা, ওর প্রাক্তন স্ত্রী'র বাপের বাড়ির লোকজন, ছেলের বন্ধুবান্ধব। সব সময় হইহই ব্যাপার! এক ব্যাটেলিয়ন ফোর্স। আর এদিকে আমি একা, কত রকমের বন্ধন, কত রকমের পরিচয়ের বোধ, কত রকমের আশ্রয়, এই সব কিছুর বিরুদ্ধে কত দিন লড়তে পারব? হেরে যাবই। একটা মেয়ের মন আর শরীরে এত রকমের আনন্দ সম্ভার থাকে না! আজকাল আমার বড্ড একা লাগে জ্যোতিষ্মানদা। চরম একা! এই পাড়ায় সেই একাকিত্ব নেই। এখানে বোধ হয় কেউই চাইলেও একা হতে পারবে না। এই উদ্যানটা আমার আজ খুব দরকার। হতে পারে, হ্যাঁ হতেই পারে আদিত্যর সঙ্গে, শুধু ওর সঙ্গে থাকতে-থাকতে আমার একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে। যতই সমৃদ্ধির হোক, ওর দেওয়া জীবনটার মধ্যে আমি আর কোনও নতুনত্ব পাই না। এটা তো ঠিক...' হঠাৎই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শর্মিলা দেখল আয়েষাদি দাঁড়িয়ে আছে লাইব্রেরির দরজার সামনে। উফ, ভাগ্যিস কথাগুলো সে সত্যি-সত্যি জ্যোতিষ্মানদেকে বলেনি!

গায়ত্রীকে একেবারে বলেই বেরিয়েছিল শর্মিলা। তাই আর সে মামার বাড়িতে ফিরল না।

তার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল আয়েষাদি, তারপর জ্যোতিষ্মানদাকে বলল, "এই যে জ্যোতিষ্মানদা, তোমার তো গরম কিছু খাওয়া বারণ। তুমি নাকি আজ আবার গঙ্গাধরের ছেলের কাছে চায়ের বায়না করেছ?"

আধা ইশারায় জ্যোতিষ্মানদা বলল, "চা ছাড়া সম্ভব নয়।"

"যা ডাক্তার বলবে, তাই তো করতে হবে? শনিবার আবার ডাক্তার দেখবে। তখন নিজেই জিজ্ঞেস করে নিও। চা খাবে, সিগারেট খাবে, মামদোবাজি? আমি তা হলে এত চেষ্টা করছি কেন? চা, সিগারেট এ পাড়ায় তোমায় কেউ দেবে না, আয়েষা ঘোষ থাকতে।"

"চলবে না, চলবে না।"

"মরে যাবে তুমি," চিৎকার করল আয়েষা, "অভীক এই লাইব্রেরিটা বাঁচানোর চেষ্টা করছে, নতুন করে সব সেজে উঠবে, বুক স্টোর হবে, তোমার দেখার ইচ্ছে নেই?"

"হবে না, হবে না! চাউমিনের দোকান হবে। বুক স্টোর হবে না ছাই। আমাকে বোকা পেয়েছ! আমার সইটার জন্য বোকা বোকাচ্ছে আমাকে!" জ্যোতিষ্মানদা হাঁফাতে লাগল।

আয়েষাদি কোমরে হাত দিয়ে বলল, "আমি তোমাকে কিছু বোঝাতে আসিনি। বুঝেছ? আমার এখানে কোনও লেনাদেনা নেই। এ পাড়ার কারও সঙ্গে আমার কোনও স্বার্থ নেই। কাউকে আমি পুঁছি না। যেটা ঠিক মনে হয়, করি। যা বুঝি, তখনই বলি। বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে একটা লোক তাই আসি..."

হঠাৎ জ্যোতিষ্মানদা খবরের কাগজ দিয়ে নিজের মুখটা আয়েষার কাছ থেকে আড়াল করে নিল।

আয়েষাদি বলল, "বাঃ, বাঃ, বেশ, বেশ!"

জ্যোতিষ্মানদা বলল, "বিনয় বিনয়! বিনয় বলে কিছু আছে তোর আয়েষা?"

"আমি কারও খাই-পরি না যে, বিনীত হতে হবে!"

"ওইটুকুই তো সার শিখেছ।"

শর্মিলা তো এসব শুনে হতভম্ব!

আয়েষাদি একটু চুপ করে থেকে এবার সরাসরি তাকে বলল, "নিজের দুঃখের সাতকাহন না গেয়ে পাগলকে একটু বোঝা, গরম চা কোনওমতে খাওয়া চলবে না।"

আয়েষাদি চলে যাওয়ার পর শর্মিলা বলল, "তোমার ভালর জন্যই বলছে কিন্তু।"

জ্যোতিষ্মানদার চোখ দু'টো হঠাৎ কেমন ঘোরালো হয়ে উঠল, "আমি এদের কাউকে বিশ্বাস করি না। কোনও মানুষকে আমি বিশ্বাস করি না।"

শর্মিলা উঠে দাঁড়াল আস্তে-আস্তে। জ্যোতিষ্মান বলল, "উঠছিস, আমাকেও একবার বেরতে হবে।"

"কোথায় যাবে? আমি যাব সঙ্গে?"

"সঞ্জয় নিয়োগীর বাড়ি থেকে দু'টো বই আনতে যাব। এক মাস হল নিয়েছে। ফেরত দেয়নি, দশ টাকা ফাইন হয়ে গেছে!" ঘড়ঘড়ি উঠছে জ্যোতিষ্মানদার কথার সঙ্গে।

সে বেরিয়ে এল বাইরে, জ্যোতিষ্মান সমস্ত আলো নেভাল লাইব্রেরির, দরজার হুড়কো টেনে তালা দিল। শর্মিলা দেখল, কী ভীষণ হাত কাঁপছে লোকটার।

গায়ত্রীকে একেবারে বলেই বেরিয়েছিল শর্মিলা। তাই আর ফিরল না মামার বাড়িতে। তিন মাথার মোড়ের দিকে

হাঁটতে লাগল সে। হঠাৎ তাকে কেউ একটা ডাকল পাশ থেকে, "আই ভানু, ভানু?"

বাঁ দিকে তাকাতে সে দেখল, অনু-রুণু দুই বোন বসে রয়েছে বাড়ির রকে। অনু-রুণু দুই বোনের মধ্যে অনু বছরখানেকের বড়। দু'জনেই তার বন্ধু এককালের, একই স্কুলে পড়ত তারা। যদিও দুই বোনই মাধ্যমিকের পর আর পড়াশোনা করেনি।

সে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল ওদের দিকে। অনু-রুণু দু'জনেই খুব হাসল তাকে দেখে, "বাবাঃ, চলে যাচ্ছে। দেখেই না তাকিয়ে, বাবা!"

সে বলল, "না, না, চিনব না কেন? কেমন আছিস তোরা?"

"যেমন দেখছিস!" দু'জনেই বলল, "তোর কথা বলছিল অরুণদা। বলছিল ভানুকে একদিন দুপুরবেলা আসতে দেখলাম।"

এই অরুণদা অনু-রুণুর দু'জনেরই প্রেমিক। দু'জনেই অরুণদাকে ভালবাসে। দু'জনেই কেউ বিয়ে করেনি। গায়ত্রী বলছিল, এখনও ওরা তিনজনে সিনেমায় যায় একসঙ্গে। দু'জনের হাতেই রুপোর বালা, গলায় রুপোর হার, দু'জনের কানেই দুটো সোনার রিং। দু'জনেই কালো টিপ পরে। সে দেখল অনু-রুণুর মধ্যে অনুর চুল পেকেছে।

অনু বলল, "তা তোর বরকে একদিন আন। দেখি!"

"তোর বরকে দ্যাখা ভানু। আরে, নিয়ে নেব না। শুধু দেখব!" বলল রুণু।

আশ্চর্য! দুই বোনেরই এতটা সায়া বেরিয়ে আছে শাড়ির নীচ থেকে। ঝোঁড়া সায়া।

অনু-রুণুদের অবস্থা খুব খারাপ। অরুণদার সঙ্গে প্রেমটাই বোধ হয় ওদের জীবনের একমাত্র ভাল জিনিস। দু'জনেই তাই সেটাকে পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

রুণু শাড়ি তুলে পায়ের গোছ চুলকালো, "তুই এখন আসবি মাঝে-মাঝে?"

"ভাল তো! আসবি মাঝে-মাঝে," অনু বলল, "তুই তো অনেক ফরেন ট্যুর করিস, আমার জন্য একটা ফিল দেওয়া ছাতা আনিস তো পারলে?"

"ধুর, ছাতা দিয়ে কি হবে? একটা ভাল সেন্ট এনে দিবি!" রুণু বলল।

হরিন্দর তাকে দেখতে পেয়েছিল। গাড়ি নিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল পাশে, সে অনু-রুণুকে বলল, "চলি রে, একটু দেরি হয়ে গেছে।"

গাড়িতে বসে সে ভাবল অনু-রুণু দুই বোন জীবনে কী পেয়েছে? তারই তো বয়সি। গাওয়াপাওয়ার কোনও সার্থকতা না থাকা সত্ত্বেও দু'জনের তা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই। সারাক্ষণ হাসছে। এই তো অনু-রুণু একটা কাঁসার সানকিতে মুড়ি- চপ খাচ্ছিল। একবার কলেজ থেকে বন্ধুদের সঙ্গে একটা রেস্তরাঁয় খেতে গিয়ে শর্মিলা দেখেছিল, অরুণদা আর অনু-রুণুও সেখানে গেছে। অনেকের ভিড়ে ওরা তাকে লক্ষ করেনি। সে দেখেছিল, অরুণদা এক প্লেট পরোটা আর কষা মাংস খাচ্ছিল। আর এক প্লেট চাউমিন থেকেই অনু-রুণু দুটো চামচে করে খাবার তুলে নিচ্ছিল মুখে। এত বছরে ওরা একই রয়ে গেল, বদলাল না।

॥ ৯ ॥

শাঁটুল বেলা আড়াইটে নাগাদ বাড়ি ফিরল বিস্তর ঘোরাঘুরি করে। মোটরবাইকটা রেখে এল ছাতিম তলায়, গলির মুখে। বাড়ি ঢুকল জিন্‌সটা বদলে বারমুডা পরবে বলে। তখনই ভাইঝি মিনি এসে মোবাইলটা ধরল। এই মাসেই এই দামি ফোনটা কিনেছে শাঁটুল, ১০ হাজার টাকা দিয়ে। সে মিনির হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিল সঙ্গে-সঙ্গে। ধমকে বলল, "অ্যাই, ফোন নিতে বারণ করেছি না?" ছিঁচকাঁদুনে মিনি কাঁদতে শুরু করে দিল ভ্যাঁ করে!

অমনই বউদি তড়পাতে লাগল তাকে, "শাঁটুল, তুমি মিনিকে কথায়-কথায় ধমকাও কেন? কীসের জন্য? ও তোমার কোন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে? আজ আমি তোমার দাদা এলে বলব, একটা বাচ্চার পিছনে লাগছে।"

সে খচে গেল জোর, "আমি ওর পিছনে লাগব? সারাদিন বাড়ি থাকি না, বাড়ি ঢুকলেই তুমি কোনও না-কোনও ইস্যু নিয়ে ঝগড়া লাগাও বউদি। কেন, সেটা আমি খুব ভাল করে বুঝি।"

মা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, "ও তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে কেন? তোরই খুব মেজাজ হয়েছে। দু'টো টাকা রোজগার করছিস বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস? তাও যদি টাকাগুলো বাড়িতে দিতিস। শুধু নিজের পিছনে খরচ করছিস, দামি-দামি জিনিস কিনছিস। সংসারে দিস? আমাদের ফ্যামিলিতে বাড়ির বউয়ের সঙ্গে কেউ খারাপ করে কথা বলে না শাঁটুল।"

"কী আমার ফ্যামিলি রে!"

মা'র ধারণা সে কোনওদিন মাকে দেখবে না। দাদা-বউদিই দেখবে। তাই মা খুব দাদা-বউদির ধামা ধরে চলে। চলে চলুক, তারই ভাল। আর যে কথাই হোক, মা টাকার কথা তুলবে। মা'র একটা অদৃশ্য শুঁড় আছে, টাকা শোঘার! আজ শিবচরণ মুখার্জি লেনে একটা ফ্ল্যাট দেখে এসেছে শাঁটুল। মালিক ফ্ল্যাটটা ভাড়ায় দেবে। চার কাঠা জমির উপর প্রায় চোখের সামনে পরের পর বাড়ি ভেঙে চারতলা ফ্ল্যাটটা তৈরি হল। এদিকে পুরনো বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট তৈরি হলে সেগুলো প্রত্যেকটা খুব দম চাপা হয়। গায়ে-গায়ে বাড়ি। নতুন ফ্ল্যাটগুলোতে আলো হাওয়ার খুব অভাব। এই ফ্ল্যাটটা তা নয়। হেভি আলো। দক্ষিণে বারান্দা। ভাড়া চাইছে সাত হাজার। মালিক আজ চাবি দিয়ে দিয়েছে তাকে। শাঁটুল জানে, যাকে দেখাবে, তারই পছন্দ হয়ে যাবে ফ্ল্যাটটা। তার খুব ইচ্ছে, এরকম একটা ফ্ল্যাটে থাকে। এখন যা রোজগার দাঁড়িয়েছে, এরকম একটা ফ্ল্যাট সে নিজেই ভাড়া নিতে পারে। কিন্তু এখনও সময় আসেনি। তাকে ঢিকা জমাতে হবে। ধীরে-ধীরে তার কাজ কারবার সে সরিয়ে নিয়ে যাবে অন্য দিকে। সাউথের দিকে। বছর তিন-চারের মধ্যে সে নিজেকে সাউথ ক্যালকাটায় দেখতে চায়! অর্ধব মুখার্জি বলে এক প্রোমোটারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে শাঁটুলের। সব পশ এলাকায় কাজ করছেন ভদ্রলোক। আস্তে-আস্তে এই লোকটার সঙ্গে র‍্যাপোর্ট বাড়াতে হবে, যাতে সে সাউথেও কাজ করতে পারে। এই যেমন সল্টলেকেও সে ঢুকে পড়েছে এবার। চারটে দালান মাঝখানে থাকলেও আলটিমেটলি বি ই ব্লকের ফ্ল্যাটটা তার হাত দিয়েই লিঙ্ক হল। পার্টি তার।

কিন্তু সে অনেক টাকা রোজগার করলেই যে সোহিনী সাউথ সব ছেড়েছুড়ে তার কাছে চলে আসবে, এমনটা সে এখনও ভাবছে না। সব কিছুর সময় লাগে। তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে সোহিনীর অনেক সময় লাগবে। রোকাহিই করুক আর যাই করুক, শাঁটুল পরিশ্রমী, জেদি। একদিন সে অনেক বড় জায়গায় চলে যাবে, সে জানে। কিন্তু তখনও সে থাকবে এইচ এস। সোহিনীর এখানেই সবচেয়ে বড় বাধা তাকে নিয়ে। এই তো শনিবার পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তরাঁয় বসে সোহিনী তার ডান হাতটা আলতো করে ছুঁয়েই বলল, 'তোমার আঙুলগুলো কী সুন্দর, লম্বা-লম্বা! নখের শেপটাও ভাল। তোমার তো পড়াশোনা হওয়া উচিত ছিল। ফাইন আর্টসের দিকে যেতে পারতে। কী যে করলে! পড়াশোনাটা করলে না?' দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল মেয়েটা। তখনই সে বুঝেছিল, নিজের মনের সঙ্গে সারাক্ষণ একটা যুদ্ধ চলছে সোহিনীর। তবে লালুকে বললে লালু বলবে, 'কোনও যুদ্ধের গন্ধ নেই। কমলের বউ তোকে থোড়াই সিরিয়াসলি

নেয়। ও কি তোকে 'আই লাভ ইউ' বলেছে কখনও? ওটা একটা টাইম পাস। যদি তুই ভাবিস, কমলের বউ তোকে ভালবাসে, তা হলে তুই ব্যাটা মহা মূর্খ!' শাটুল নিজেও কি সোহিনীকে ভালবাসে? বোধহয় না। তবে সোহিনীকে দেখলে আগে যেমন আগুন লাগাত শরীরে, মাথাটা চড়াক-চড়াক করত, একবার বাথরুমে ঘুরে আসতে হত, এখন সেটার সঙ্গে একটা ফাল্গুন মাসের চিঠি-চিঠি হাওয়ার মেজাজও এসেছে বুকে! যখন এপাড়ার বাতাসে চামেলির গন্ধ পাওয়া যায়, কদম ফোটে আর তখন গোস্বামীদের দলটা পাড়া মাতাতে আসে প্রতি বছর, ওরা আসে বিকেলে, দূর থেকে মৃদু-মৃদু সুরভিত হাওয়ায় মিশে যায় খঞ্জনীর শব্দ। যত কাছে এগিয়ে আসে ঢোল আর খঞ্জনীর বাদ্য ভারী হয়ে দোলে বুকের কাছটায়। ওরা গোস্বামীদের কচি বউটা তাকে দেখলেই হাতে একটু চমনবাহার দিয়ে বলে, 'চলো না গো, কৃষ্ণদাবন চলো আমার সঙ্গে!' সে চোখের তারায় হাসে, কান চুলকোয়, মাথা চুলকোয়। ওই বউটার জন্য পাড়ায় বন্ধুদের কাছে তাকে ঠাট্টা-তামাশা শুনতে হয়। বউটার নাম উত্তরা। 'তুমি হলে ওস্তাদ গো, ওস্তাদ!' বলে উত্তরা, আর বার এসে তোমাকে কী দিই দেখো!' সে বলেছিল, 'কী দেবে?' 'আমার কোমরের কার!' ফিসফিস করে বলেছিল উত্তরা। 'যাঃ!' শাটুল সত্যিই লজ্জা পেয়েছিল। 'তাতে কড়ি লাগানো। কড়ি মানে কি বোঝ তো? হুঁ?'

সে যাই হোক, আজকাল সোহিনীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় তার মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াটা হয়, তাকে বর্ণনা করতে গেলে এই সব কিছু দিয়েই উপমাটা তৈরি করতে হবে। খঞ্জনীর আওয়াজটাও ধরতে হবে, কদম ফুলও ধরতে হবে, উত্তরার পালিশ পরা ছেনালিটাও বাদ দেওয়া যাবে না!

ছাতিমগাছতলায় চলল শাটুল এক বালতি জল নিয়ে, মোটরবাইকটা তার প্রাণ! একদিন ছাড়া-ছাড়ুই বাইকটা ভাল করে ধোওয়া-মোছা করে সে। নিজের সমস্ত জিনিসের প্রতিই তার অগাধ যত্ন। জল-নেকড়া দিয়ে চাকাগুলো ধুতে লাগল শাটুল। এর পর সে জামা-প্যান্ট কাচবে। ছাতে উঠে মেলবে সেগুলো। আরও কাজ আছে। সি ডি প্লেয়ারে ধুলো জমেছে, স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করবে। শেষে নর্দমা পরিষ্কার করে সে শ্যাম্পু-ট্যাম্পু করে স্নান করে খাবে। খেতে-খেতে আজ চারটে। ঠিক পাঁচটার সময় এক পার্টিকে উল্টোডাঙায় একটা বাড়ি দেখাতে যেতে হবে তাকে। বিকেলে বেরিয়ে আজ তার নানা কাজ আছে। সম্ভোষ উকিলের কাছে তিনটে এগ্রিমেন্ট তৈরি করতে দিতে হবে। পাড়ায় ফিরতে-ফিরতে রাত দশটা। তখন নিমাই খুড়োর রকে লালু ছাড়া তেমন কেউ থাকবে না। বিকেলে বেরোনোর মুখে সোহিনীকে একবার বারান্দায় দেখতে পেলেই সে খুশি। কিন্তু সোহিনীকে বললেও কখন মেয়েটার মর্জি হবে, কখন হবে না, কে জানে? সোহিনী বলবে, 'জানো তো, আমার ভীষণ মুড সুইং হয়।' তার বাইক ধোওয়া যখন প্রায় হয়ে এসেছে, দর-দর ঘামে গেঞ্জি টেঞ্জি ভিজে একসা, তখন তার পাশে এসে দাঁড়াল লালু, "হেভি ব্যাওয়াল হচ্ছে মিত্তির বাড়িতে। কমলের বউ ডুকরে-ডুকরে কাঁদছিল।"

ন্যাতাটা চিপে বালতির জলটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শাটুল, "কাঁদছে? চেঁচিয়ে কাঁদছে?" আশ্চর্য! চেঁচিয়ে ঝগড়া করা, চেঁচিয়ে কাঁদার মেয়ে তো সোহিনী নয়। ও তো সাউথ ক্যালকাটার মেয়ে। নর্থের মেয়েদের সব্বার এই সমস্যাটা আছে। "হ্যাঁ, শুনেই তো চলে এলাম তোকে খবরটা দিতে।"

"কমল নেই বাড়িতে?"

"তা জানি না। আমি খেয়ে উঠে একটা সিগারেট নিতে বেরলাম, তখন শুনলাম।"

"কী নিয়ে চেঁচামিচি কিছু বুঝলি?"

"না, না!" লালু হাত ঝাড়ল, "তোর দরকার, তুই ফোন করে খবর নে, ফোন কর।"

শাটুল ভাবল, এখনই ফোন করাটা কি ঠিক হবে? সে লালুকে বলল, "তুই যা, আমি দেখছি।"

লালু বলল, "আবার বেশি নাক গলাতে যাস না। যতই হোক, অন্যের বউ।" এই 'অন্যের বউ'টা লালু বার-বার ইচ্ছে করে বলে। বলে তার পৌরুষকে হ্যাটা করে। শালা, যাকে আমি চাই, সে রোজ অন্য একটা ছেলের পাশে শোয়! ঠিক! ধিক আমাকে! আমি এটা সহ্য করি কী করে? লালু এভাবে হিড়িক দেয়। তার সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেয়, তার আর সোহিনীর কেসটা পাটি 'ফস্টি নস্টি!' লালুকে না একদিন ঘাড়ে রক্তা মেরে বসে শাটুল।

সে গলা চড়াল হঠাৎ, "আমি কী করব তুই আমায় বলে দিবি? আমি শালা তোর হন ধরে বসে আছি?"

"যা, যা!" বলল লালু, "খেতে যা, তোর খিদে পেয়েছে!"

"আরে রেখে দে, অভীকের ডাকর! তোকে দিয়ে আয়েষাদি এবার নীচের সায়া কাচাবে, দ্যাখ না তোর কী হয়!" লালুর দুর্বলতায় পতাকা পুঁতে দিল শাটুল। "ওদের তো ওয়াশিং মেশিন আছে। ১০ কেজি লোড।"

"তুই মহা হারামি। তোর নজর এখন কোথায় ঘুরছে আমি জানি না শালা? ঠিক বয়সে বিয়ে হলে বাঁধনের মতো মেয়ে হত তোর লালু!"

"কী যা তা বলছিস শাটুল। বাঁধন তো আমাদের চেয়ে মাত্র ১০-১২ বছরের ছোট। তোর ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা, তুই তো তার আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছিস।" এসব খারাপ-খারাপ কথা ছেলেমাত্রই বলে থাকে। লালু একটু গলাটা নামাল, "শোনো বাপধন, তোমাকে একটা খবর দিই। বাঁধনের সঙ্গে একটা ছেলের প্রেম চলছে, ফেসবুকে আলাপ। ছেলেটা থাকে ভূপেন বোসে। নামটাও বলে দিচ্ছি, কল্লাস্ত সিংহ রায়। ডাক নাম তাতারা!"

শাটুল বলল, "বাসি খবর, আমাকে খবর বেচতে আসিস না। আমি বহু আগে থেকেই জানি!" মনটা পড়ে আছে সোহিনীর দিকে। পকেটের ফোনে হাতের চাপ দিল শাটুল। কমল দুপুরে বাড়িতেই থাকে, তাই দুপুরের দিকে সোহিনীকে কখনও ফোন করে না শাটুল। তবু সে

কমল দুপুরে বাড়িতেই থাকে, তাই দুপুরের দিকে সোহিনীকে কখনও ফোন করে না শাটুল।

আজ একটা ট্রাই মারল। হাত নিশপিশ করছিল তার।
ফোন ধরল সোহিনী, কেটে দিল না, "হুঁ বলো..."
"কাঁদছ নাকি?"
"নাঃ!"
"কী হয়েছে কেসটা?"
"তেমন কিছু নয়।"
"বলা যাবে কি যাবে না?"
"আমার এক দিদি থাকে বেঙ্গালুরুতে, ওর হাঙ্কব্যান্ড তিন-চার মাসের জন্য বিদেশ যাচ্ছে। আমাকে বলল...দাঁড়াও, দরজাটা বন্ধ করে আসি।"
"কমল কোথায়?"
"কোথায় আবার! মা'র ঘরে ঘুমোচ্ছে খোকন।"
সোহিনীর দরজা বন্ধ করা শুনতে পেল শাঁটুল।
"তো কী হয়েছে?"
"আমাকে দিদি বলল, 'তুই মাসখানেক আমার কাছে এসে থাক। ও সব জানে। মানে, কমল আর আমার ব্যাপারটা।"
"আর আমাদেরটা?"
"উঁহু।"
"সেটা তো বলার মতো নয় নাকি?"
"শাঁটুল, আমার এখন ফ্যামিলির সাপোর্ট দরকার। নাকি আমি সবাইকে বিপক্ষে করে তুলব?"
"একদিন তো বলতেই হবে।"
"কী বলতে হবে?"
শাঁটুল বলতে পারল না, তার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল খুব। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।
"আমি কমলকে বললাম, আমি বেঙ্গালুরুতে গিয়ে থাকব মাসখানেক। কমল বলল, মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আমি বললাম, যাও, তা হলে জিজ্ঞেস করে এসো। কমল জিজ্ঞেস করে এসে বলল, কান্তা বাঈ বলেছে আষাঢ়-শ্রাবণে আত্মীয়স্বজনদের অনেক বিয়ে আছে। এখন কোথাও যাওয়া চলবে না। বাড়ির বউ। একমাত্র ছেলের বউ। হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়ালেই হবে? কার বউ আমি? কীসের বউ?"
শাঁটুলের মতো ছেলের রাগ ঢাগ হয়। আজ কিন্তু শাঁটুলের অভিমানে গলাটা টনটন করে উঠল, "সোহিনী, তুমি আমাকে একবারও জিজ্ঞেস করনি তো বেঙ্গালুরু যাবে কি না?"
"হোয়াই? হোয়াই ডু আই নিড টু অস্ক এনি বডি শাঁটুল? আমি তো এদের কাছে, কমলের কাছেও পারমিশন চাইনি। আমি শুধু যেতে চেয়েছি। এখান থেকে অনেক দূরে।"
সোহিনীকে শাঁটুলের বারবারই অচেনা লাগে, এখনও লাগল।
"আমার কাছ থেকেও দূরে যেতে চাও তুমি?" এরকম একটা ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলে ফেলল শাঁটুল।
সোহিনী চুপ করে থাকল একটু, "মাত্র তো এক মাসের জন্য। আমি আর পারছি না শাঁটুল। বোঝো তো।"
"শেষ অবধি কী দাঁড়াল?"
"আমি কমলকে বললাম, ঠিক আছে, ক'টা দিনের জন্য তুমিই আমাকে বেড়াতে নিয়ে চল তা হলে? গোয়া-টোয়া কোথাও?"
শাঁটুল কোনও কথা উচ্চারণই করতে পারল না এটা শুনে!
"কমল বলল, তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব ভাবলে কী করে? হি ইজ অ্যা চিট ইউ নো? ওকে আমি শায়েস্তা করেই ছাড়ব। তুমি দেখে নিও," সোহিনী কাঁদছে। সে ফোনটা রেখে দিচ্ছিল, সোহিনী খুব নরম করে ডাকল তাকে, "শাঁটুল মিট করবে?"
এবার নিজেকে ফিরে পেল শাঁটুল! মটকা গরম হল তার। সে বলল, "কীসের জন্য?"
"একটু ঘুরতাম তোমার বাইকে চড়ে। মনটা ভাল নেই।"
সাংঘাতিক প্রস্তাব! সে এ পর্যন্ত সোহিনীর সঙ্গে খুব নামী দামি রেস্তরাঁয় দেখা করেছে। তার মোটরবাইকে সোহিনী বসবে, এটা শাঁটুল ভাবেওনি কখনও! মোটরবাইকে চড়বে, দুটো শরীর ঘনিষ্ঠ হবেই। ব্রেক কষলে সোহিনীর বড়-বড় দুটো বুক এসে তার পিঠে ধাক্কা খাবে — এ সুযোগ শাঁটুল হারানোর কথা ভাবতেও পারে না। কিন্তু সে বোধ হয় প্রেমে পড়েছে মেয়েটার। নইলে তার মধ্যে এসব কী লক্ষণ ফুটে উঠছে? কষ্টের? যন্ত্রণার? সত্যি তার চোখের কোণ দুটো জ্বালা করছে! কমলের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা কী করে বলল সোহিনী? ফের রেগে উঠল শাঁটুল। খেলাচ্ছে? তাকে খেলাচ্ছে?
সে বলল, "আমার সময় হবে না।"
"সময় নেই?"
"না।"
"তোমারও সময় নেই?" হাহাকার করে উঠল সোহিনী, "আমার কেউ নেই, কেউ নেই!"
শাঁটুল দু' পা পিছিয়ে গেল, "এই তো বরের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছিলে।"
"কোনওদিন যেতাম না। আমি শুধু কমলকে ডিস্টার্ব করে যেতে চাই।"
"তাতে কী হবে?"
"শাঁটুল তোমাকে বলিনি, কাউকে বলিনি, হাউ হি হ্যাজ ট্রিটেড মি, দ্যাট মামাজ বয়, দ্যাট মানার ফাকার — কী অন্যায় করেছে আমার সঙ্গে তুমি কি জানো?"
শাঁটুলের তেজ কমে গেল, "আমি কী করে জানব সোহিনী?"
"কখন কোথায় ওয়েট করবে বলো?"
নাক টানল সোহিনী।
"স্লিজ় সোহিনী, কাল দুপুরে দেখা করি? আজ এক আইপিএস অফিসারকে টাইম দেওয়া হয়ে গেছে। ভদ্রলোক এককথার মানুষ।"
"ওকে।"

॥ ১০ ॥

নিকো পার্কের পাশ দিয়ে সোজা রাজারহাটের দিকের ফ্লাইওভারে উঠে গেল শাঁটুল। ঝড়ের বেগে বাইক চালাচ্ছে। সোহিনী জাপটে ধরে আছে তাকে। মুখটা গুঁজে দিয়েছে তার ডান কাঁধে। শাঁটুল ঠিক মাপতে পারছে না তার ভিতরে কী চলছে এই মুহূর্তে। সামান্য বেসামাল হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে! সে সাঁ-সাঁ করে উইপ্রোর পাশ দিয়ে ছুটে গেল। সোহিনী হাসছে। সোহিনী সাউথ! কোনও ইনহিবিশন নেই। ছেলেদের কনুইয়ের গুঁতো মারে না। চিমটি কাটে না, ঠোঁট কামড়ায় না দাঁত দিয়ে। লজ্জা কদাচিৎ পায়, নিজের বুকের দিকে তাকায় না বারবার, রেস্তরাঁয় বিল দেওয়ার সময় বলে, 'আমি দিই? অ্যাট লিস্ট লেট মি শেয়ার?' সেই সোহিনী সাউথ শাঁটুলকে সম্পূর্ণ জড়িয়ে ধরেছে। স্পিড কমিয়ে এবার শাঁটুল সল্টলেকে ঢুকে গেল। একটার পর একটা আইল্যান্ড পেরিয়ে যাচ্ছে। সোহিনীর শাঁটুলকে অনেক মনের কথা বলার ছিল। কিন্তু সে সব পরে হবে। আজ সোহিনী শ্যাম্পু করে আর সিঁদুর পরেনি। শাঁটুলের একবারও মনে হচ্ছে না এই মেয়েটা অন্য কারও বউ! সোহিনী খুব মজা পাচ্ছে দেখে পুলক জেগেছে তার ডানায়। সে শুধু উড়তে চাইছে। পাক খেতে চাইছে। সোহিনী চিৎকার করে বলল, "শাঁটুল, তোমার ডাক নাম কী?"
"গৌরচাঁদ দাস।"
"আর তোমার ডাক নাম?"
"মিঠু।"
"'মিঠু? সে আবার কী?"
"আমার পিসির একটা পোষা বেড়াল ছিল। সে ডাকত মিঠু-মিঠু, আমিও কথা বলতে শিখে মিঠু-মিঠু করতাম। ওটাই হয়ে গেল নাম!"
এই সময় শাঁটুলের ফোন এল একটা।

পার্টি ফোন করছে নিশ্চয়ই। সে বাইকটা দাঁড় করালো একটা বাড়ির সামনে। বিশাল বাড়ি। সামনে লন, খুব মোটা করে গাছের ফেন্সিং। তারপর কাঁটাতার। বিদেশি ডিজাইনে তৈরি দোতলা বাংলো। শাঁটুল কথা বলছে। সোহিনী বাইক থেকে নেমে বাংলোটা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল। আহা, কী বাড়ি! কি দারুণ-দারুণ সব বাড়ি আছে সল্টলেকে। এই বাংলোটার পাশের বাংলোটাও দারুণ। তবে রাস্তা তার অতটা মনঃপুত হল না। সোহিনী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বাড়িগুলো দেখতে-দেখতে চলে গেল একটু পাঞ্চাটার ভিতরে। ঠিক সেখান থেকে শাঁটুলকে আর দেখা যাচ্ছে না। সোহিনী এতক্ষণ শাঁটুলের শরীরের সান্নিধ্যে রয়েছে, সেই ওম ছড়িয়ে পড়েছে গহনে। তার মনে হচ্ছে, ইস, যদি সুযোগ থাকত, যদি একটু আদর পেত সে এই লম্বা-চওড়া ছেলেটার, তা ছাড়া শাঁটুল যে তাকে ভালবাসে, তা সে চোখ দেখে বুঝতে পারে। সোহিনী যৌনতার স্বাদ পাওয়া মেয়ে। আর অতৃপ্ত, কোনও পুরুষের প্রতি তৎগত ভাব তৈরি হলে ঘুমের মধ্যেও তার সেই পুরুষের জন্য দু'টো উরু, দুই পা দু'দিকে প্রসারিত হয়ে যায়। এই কামভাব দমন করে সে হাসিমিশ্রিত মুখে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখল ওই সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি থেকে সাদা লিনেন প্যান্ট, আকাশি টি-শার্ট পরা, চোখে অ্যাভিয়েটর সানগ্লাস পরা একটা প্রায় তারই বয়সি ছেলে গেট খুলে বেরিয়ে এল। ছেলেটা হাতের চাবি টিপে সামনে দাঁড়ানো দুধসাদা বড় একটা গাড়ির সেন্ট্রাল লক খুলল। পিক-পিক আওয়াজ করে আলো জ্বলে উঠল গাড়িটার। ছেলেটার স্টাইল আছে, ভাবল সে। ছেলেটা চোখে কালো চশমা, তবু ছেলেটা যে তাকে দেখছে, তাও বুঝতে পারল সে। ছেলেটা কি এক পা-এক পা করে তার দিকেই এগিয়ে আসছে?

"সোহিনী না? সোহিনী দত্ত?" ছেলেটা আঙুল তুলল একটা, "সাউথ পয়েন্ট?" চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলল ছেলেটা।

"মহল? তুই?"

"চিনতে পারছিস?"

"হ্যাঁ, পারব না কেন? তুই তো ফেসবুকে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছিস।'

"ফেসবুকে সকলেই আছে। কিন্তু আমার ফেসবুক করার সময় হয় না।"

"তুই তো প্লাস টু থেকে বিদেশে ছিলি। এখন কী করছিস?"

"ফ্যামিলি বিজনেস। তুই?"

"কিচ্ছু না। বিয়ে করে কাইন্ড অফ হাউজ় ওয়াইফ।"

"তুই হাউজ় ওয়াইফ? মারাত্মক ব্যাপার। বরকে নাচাচ্ছিস, না বর তোকে নাচাচ্ছে?"

সোহিনী হেসে উঠল হো-হো করে। শাঁটুলের কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে খুঁজল সোহিনীকে। মনে-মনে বলল, হেভি চঞ্চল মেয়ে। এই মেয়েকে সামলানো যার-তার কম্মো নয়। সে এদিক-ওদিক তাকাল, সরে গেল একটু বাইকটা রেখে। এবং তখনই দেখতে পেল, সোহিনী হেভি হ্যান্ডসাম একটা ছেলের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছে। বাপ রে! ছেলেটা খুব সফি! গা থেকে বড়লোকের তেজ ছড়াচ্ছে যেন। সে সট করে সরে গেল আড়ালে। কে জানে ছেলেটা কে? তার পক্ষে সামনে যাওয়া কখনওই ঠিক হবে না। এমনিতেই এভাবে বাইকে ঘোরা রিস্ক হয়ে যাচ্ছে। হয়তো তাদের অজান্তে অনেকে দেখেও ফেলেছে তাদের! ঈশ্বর জানেন, এর পরিণতি কী! মনের মধ্যে অনেক সংশয়

থাকলেও সোহিনীর প্রতি তীব্র আকর্ষণবশত সে নিজেকে আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছে। জানাজানি হলে কী হবে, ভাবতেই পারছে না। কী আর হবে! কমল ডিভোর্স দিয়ে দেবে সোহিনীকে। সে বিয়ে করবে তখন মেয়েটাকে। পাড়া ছেড়ে দেবে। সাউথের দিকে বাড়ি ভাড়া নেবে তখন। আরে, পুরুষমানুষের টাকা রোজগার করতে কতক্ষণ লাগে? সোহিনীকে গৌরচাঁদ দাস খুব তোয়াজ করেই রাখবে। আইপিএস অফিসার ভদ্রলোক নিজের যে ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিলেন, সেটা পুরো ফার্নিশড়। তাতে মাস্টার বেডরুমে যা একখানা খাট আছে না...মাথার কাছে আয়না লাগানো। ওরকম একটা খাট বানাবে শাঁটুল। সোহিনীকে সুখ দিচ্ছে দেখেও সুখ! একষ্টা ইনিংস। শাঁটুল অপেক্ষা করতে লাগল সোহিনী আসার।

ওদিকে মহুল সোহিনীকে জিজ্ঞেস করল, "তোর বর কী করে?"

সোহিনী বলল, "ডাক্তার, এম ডি।"

"ভাল ছেলেই হাতিয়েছ বস!"

"দূর, সে একটা মায়ের বুড়ো খোকা! যা-তা একদম। কোনও আম্বিশন নেই, পাড়ায় চেম্বার খুলে বসে আছে। কমফর্ট জোন থেকে বেরতেই চায় না। দেড়শো টাকা ভিজিট। তাও অনেকে দেয় না বোধ হয়। আমি একটা চার হাজার টাকার শাড়ি কিনলে কেঁদে ফেলার অবস্থা ওর! তা ছাড়া আমাদের মধ্যে কোন অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়নি কখনও!"

"লিভিং আ স্যাড লাইফ?"

"টু স্যাড। শ্বশুরবাড়িতে আমি কমপ্লিটলি লেনাট আউট। একঘরে। আমিও ওদের দেখতে পারি না, ওরাও আমায় দেখতে পারে না। এই হল সিচুয়েশন। বিয়েটা ভাঙবে একটা চাকরি পেলে। তুই বিয়ে করিসনি?"

"এবার বিয়ে হচ্ছে," বলে বেশ গম্ভীর হয়ে গেল মহুল, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি কেন আমরা? বাড়িতে চল। কফি খাবি। মা তোকে ঠিক চিনতে পারবে।"

এবার সোহিনী বিপাকে পড়ল, "বাড়িতে যাব না রে আজ। অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

"কাম অন সোহিনী, চল। ফর হাফ অ্যান আওয়ার। এনি ওয়ে! তুই এখানে কোথায় এসেছিলি? এপাড়ায় কেউ থাকে? তোর গোপন বয়ফ্রেন্ড-ট্রেন্ড? চালাচ্ছিস কিছু?" হকচকিয়ে গিয়ে সোহিনী বলল, "না, না, এসেছিলাম একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে," ফট করে বানাল সোহিনী।

"কোথায় স্কুলটা?"

তো-তো করে সোহিনী বলল, "এই আইল্যান্ড, তার পরের আইল্যান্ডে। স্কুল খোলেনি এখনও। সব প্রস্তুতি নিচ্ছে। সল্টলেকটা এত সুন্দর, তাই বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম।"

"সঙ্গে তো বাহন নেই? ওকে, চল আমি তোকে কিছুটা ছেড়ে দেব, ডোন্ট ওয়ারি।"

শাঁটুল ফোন করছে, একবার-দু'বার। মহুল স্কুলের বন্ধু, গোপনে প্রেম করছে বলতে সোহিনীর কোনও প্রবলেম নেই। কিন্তু প্রেমিক কে? না শাঁটুল দাস! বাড়ি-ফ্ল্যাটের দালাল, এইচ এস। থাকে একটা এঁদো গলিতে! নাঃ, নাঃ, অসম্ভব। এই রুচি-বিকৃতি প্রকাশযোগ্য নয়। প্রেম হতে পারে। শরীর আসতে পারে, মায়া আসতে পারে, করুণা জন্মাতে পারে। কিন্তু সামাজিকতা হতে পারে না। মহুলের ওই সফিস্টিকেশন, ঝকঝকে উপস্থিতি, ওই আভিজাত্য — সব কিছুর সামনে শাঁটুলের পরিচয় দেওয়ারই যোগ্য নয়। কমল একটা শয়তান। কিন্তু কমল ডাক্তার, মার্জিত, বনেদি বংশ। বন্ধ ঘরে কমলকে সে লাথি মারতে চায় রোজ। কিন্তু পরিবার, পরিজন, আত্মীয়, বন্ধু সকলের সামনে কমলের পাশে দাঁড়াতে তার অশ্রদ্ধা হয় না কখনও।

"শোন না, আমার শ্বশুরের একটা আম্বাসাডর ছিল। সেটা সেল আউট করে একটা ডিজায়ার কেনা হয়েছে। তাকে রোজ যোগ্যতা-মোছা হয়, তোয়াজ করা হয়, তারপর গ্যারেজে চাবি দিয়ে দেওয়া হয়। নর্থের লোকেরা মহা কৃপণ, এক পয়সা খরচ করবে না। পেট্রলের দাম যত বার বাড়ে, আমার শাশুড়ি বলেন, 'আর কেন? এবার গাড়িটা বিদেয় করো।' একদম ভোগ করতে জানে না রে ওরা! রাতে কুমড়োর ঘ্যাট আর রুটি খাবে। আমি কী করি জানিস না? রান্নাঘরে যাই, দুটো ডিমের পোচ বানাই। ওদের দেখিয়ে-দেখিয়ে খাই।"

মহুল হা-হা করে হাসতে লাগল, "কী ডেসপারেট সিচুয়েশন তোর!"

সোহিনীর মনে হল, মন খুলে কথা বলতে পেরে তার অনেক হালকা লাগছে। শাঁটুলের সঙ্গে কথা বলে বলে বোর। বাট ইউ হ্যাভ নাথিং টু চুজ উইথ শাঁটুল।

"দাঁড়া, তোর শ্বশুরবাড়ি একদিন যেতে হবে, ইন্টারেস্টিং প্লেস।"

"যাস না খবরদার। হার্ট ফেল করবে আমার শাশুড়ি। কত বয়ফ্রেন্ড আসছে বাড়িতে বলে পা ছড়িয়ে কাঁদতে শুরু করবে!" সোহিনী থামল, "অ্যান্ড লেট মে টেল ইউ দে আর রিয়্যালি ন্যাস্টি পিপল!" বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়তে-নাড়তে বলল সোহিনী, "বিয়ের পর শাশুড়ি আমাকে বারান্দায় নিয়ে বসিয়ে বাড়ি দেখিয়ে-দেখিয়ে পাড়ার সবার পরিচয় দিত, 'এই যে ওই বাড়িটা দেখছ? ওটা শর্বরীদের বাড়ি। শর্বরীর সঙ্গে জানো তো ওর ছোট কাকার ভালবাসা ছিল। পেটে বাচ্চাও চলে এসেছিল। সে কী কেলেঙ্কারি ব্যাপার! মা গো, গা গুলিয়ে উঠবে! তারপর শর্বরী গলায় দড়ি দিয়ে মরল! আর ওই যে সবুজ লোহার গেট একদম একতলা সমান উঁচু বাড়ির ভিতর কী হচ্ছে, কেউ জানতে পারবে না! ওরা সোনার বেনে। ওই বাড়ির বড় বউ বাড়িতে ল্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ায়...'ল্যাংটো' বুঝলি তো? নেকেড..."

"আরে বুঝব না কেন? আমাকে কি তুই ইংরেজ ভাবছিস? আমি পাতি বাঙালি সন্তান।"

"হ্যাঁ, তো ল্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ায়, চুল এলো করে, বিশাল চোহারা, ওইটাই হল বড় বউয়ের বড়লোকি! বাড়িতে চাকরবাকর ঘুরছে। ও বাড়িতে কোনও চাকরবাকর কাজ করতে ঢুকে আর কখনও বেরতে পারে না। চাকরকে পাশে নিয়ে শোয়, চাকর স্নান করায়, চাকর খাইয়ে দেয়।' শুনে আমি বললাম, 'আচ্ছা মা,

মহুল স্কুলের বন্ধু, প্রেম করছে বলতে সোহিনীর প্রবলেম নেই। কিন্তু প্রেমিক কে? না শাঁটুল!

বড় বউ কি সাইকোপ্যাথ? মাথাখারাপ? পাগল? উত্তর, 'ওই আর কী!' ভাব, চাকরের সঙ্গে মিন করছে নোংরা সম্পর্ক, সত্যিটা বলছে না যে, বড় বউ জাস্ট পাগল, উন্মাদ। এই হল উত্তর কলকাতা!" শাঁটুল সমানে ফোন করে যাচ্ছে আর সোহিনী ফেঁসে গেছে বেজায়। এটা তো সম্ভব নয় যে মহুলের সামনে দিয়ে সোহিনী শাঁটুলের বাইকে গিয়ে উঠবে। অগত্যা সোহিনী ফোনটা সুইচ অফ করে দিল। রাজি হল মহুলের বাড়িতে দু' মিনিট বসতে। ভাবল, শাঁটুলের সঙ্গে মিশে-মিশে সে একটু হ্যা-হ্যা পার্টি হয়ে গেছে নাকি? নিজেকে একটু গুছিয়ে নিল সোহিনী। তারপর বহু বছর পর মহুলের মাকে দেখে গাল বাড়িয়ে দিয়ে উমু করে বলে উঠল, "কেমন আছ আন্টি?"

শাঁটুল দেখল সোহিনী ওই বাড়িটায় ঢুকে গেল। সোহিনীর ফোন অফ হয়ে গেছে। একটু সময় তার মাথার ভিতরটা হালকা হয়ে গেল! ও জাস্ট চলে গেল? সে যে মাথার মোড় অবধি বেশ লোকজনের ভিড়। কী হয়েছে জানতে চাইল শাঁটুল। জ্যোতিষ্মানদা মুখ থেকে রক্ত তুলতে-তুলতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কতক্ষণ, কেউ জানে না। দরজা ভেঙে বের করে জ্যোতিষ্মানদাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মকাইদা কেউ দায়িত্ব নিতে চাননি। আয়েষাদিই আগে ট্রিটমেন্ট করানোর চেষ্টা করছিল, আয়েষাই লোকজন জুটিয়ে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছে। আজ রাতেই ঠাকুরপুকুরে ট্রান্সফার করা হবে।

নার্সিংহোমের নাম জেনে নিয়ে তখনই বাইক ঘুরিয়ে সেখানে ছুটল শাঁটুল। লালুকে যেতে-যেতে ফোন করল, "তুই আমাকে ফোন করিসনি কেন গাড়ল?" সে বলল, "তুমি গেছ প্রেম মারাতে, ডিস্টার্ব করব?"

"সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না লালু।" লালু চলে গেছে আয়েষাদির সঙ্গে, আগেই।

শাঁটুল কাঁধ চেপে ধরল, "তুই এসেছিস, শোন শাঁটুল! অভীকদাকে ফোন করে ডাক। জ্যোতিষ্মানদা বোধহয় সুইসাইড করতে গেছিল!"

॥ ১১ ॥

দু'দিন যমে-মানুষে টানাটানি চলল। একবারই জ্ঞান ফিরেছিল জ্যোতিষ্মানের। তারপর সেই যে আধবুড়ো লোকটা কোন অন্ধকারে তলিয়ে গেল আর চেতনা ফেরত এল না। তৃতীয় দিন যদিও ডাক্তার বলল, 'অবস্থা একটু স্টেবল।' চতুর্থ দিন শহরের এক বিখ্যাত দৈনিকের পঞ্চম পাতায় ছোট করে খবর বেরল একটা, 'নকশালপন্থী জ্যোতিষ্মান ঘোষাল গুরুতর অসুস্থ।' আত্মহত্যার চেষ্টাটা লেখা হল না, অভীক প্রভাব খাটিয়ে খবরটা ধামাচাপা দিয়েছিল। ভিতরের খবরে যা-যা লেখা হল, তাতে বোঝাই গেল, নাম বিপ্লবের জের এখনও পিছু ছাড়েনি জ্যোতিষ্মানের। মাঝখানে চল্লিশটা বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পুলিশ অফিসার হত্যা, প্রমাণাভাবে '৭৪-এ ছাড়া পাওয়া, দমদমে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি, ভাঙচুর...সবই ছুঁয়ে গেল খবরটা, সপ্তম দিনে ভোরবেলা রাস্তায় বেরিয়ে পাড়ার লোকেরা দেখল লাইব্রেরির দরজার গায়ে সাঁটা একটা লাল পোস্টার। পোস্টারের উপরে একটা মালা, পোস্টারে লেখা, 'কমরেড আমরা তোমাকে ভুলছি না, ভুলব না।' বেলা বাড়ার আগেই এই খবর ছড়িয়ে পড়ল পাড়ায়। পাড়ার ভিতর নকশালদের পোস্টার? যুবক ও মধ্যবয়সিরা যে যার কাজে চলে গেল সেদিন তাড়াতাড়ি। কিছু বুড়ো-হাবড়া বসে-বসে রোমন্থন করতে লাগল জ্যোতিষ্মানকে ধরে নিয়ে যাওয়ার দিনটা। দু'-একজন বলল, 'কেউ বলতে পারে না, হয়তো জ্যোতিষ্মান সত্যিই জড়িয়ে পড়েছিল আন্দোলনে!'

আয়েষা লালুকে সঙ্গে নিয়ে নার্সিংহোম যাচ্ছিল জ্যোতিষ্মানকে দেখতে রোজকার মতো। অভীক বাধা দিল, "তুমি যাবে না। অন্য কেউ যাক। লালু যাক।"

"কেন?"

"আমরা কংগ্রেসি। এসবের মধ্যে আমাদের না থাকাই ভালো। ডিসট্যান্স তৈরি করো আয়েষা। আমার একটা পলিটিক্যাল ফিউচার আছে।"

"তোমার পলিটিক্যাল ফিউচার? ও, তুমি ভোটে দাঁড়াবে?"

"হয়তো।"

"মদের পিপে থেকে মুখ তুলবে, তবে

শাঁটুল দেখল সোহিনী ওই বাড়িটায় ঢুকে গেল। তখন সোহিনীর ফোন অফ হয়ে গেছে।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, তাকে একটা কথা বলা — কিন্তু না! বড়লোক, হ্যান্ডসাম ছেলেটাকে পেয়ে ভুলে গেল তার কথা। এক মুহূর্ত শাঁটুলের মনে হল, ওই বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে 'সোহিনী, সোহিনী' বলে ডাকে। ক্রমশ তার শূন্য মাথার মধ্যে লালবর্ণ রাগ দাপাতে লাগল উঠে এসে। সে নিজেকে ধিক্কার দিল, কী গাড়ু সে! এই মুহূর্তে তার কোথাও কোনও আশ্রয় নেই, আর কোনওদিন, আর কোনওদিন সে সোহিনীর মুখ দেখবে না! তার মনে পড়ল, সোহিনী যেদিন তাকে বারান্দা থেকে হাত তুলে চড় দেখিয়েছিল, সেদিন সোহিনীর চোখে ছিল অবজ্ঞা! সেই চড়টা তার গালে বসে গেল এখন! দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বাইক ছোটাল শাঁটুল। ট্র্যাফিক সিগনাল ভেঙে পাড়ায় ফিরল সে। তখন ছ'টা বাজে। পাড়ায় ঢুকেই দেখল, অনাদি ঘোষাল স্ট্রিট থেকে তিন

"কী অবস্থা?"

"এবার কেমো না দিলেই নয়। কিন্তু জ্যোতিষ্মানদা তো কেমো নেবে না বলে দিয়েছে। পুরনো নকশাল, তেজ খুব।"

"জ্ঞান ফিরেছে?"

"ফিরেছে।"

"আমি আসছি।"

সে গিয়ে পৌঁছল নার্সিংহোমে। সেই সল্টলেক। আয়েষাদি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছে। বীমানাথও সেখানে। মকাইদাও আছে। মুখ ভেটকে দাঁড়িয়ে ওয়েটিং এরিয়ার সামনে। সে লালুর দিকে এগিয়ে গেল। লালু বলল, "শাঁটুল তোর গা থেকে একটা উগ্র সেন্টের গন্ধ বেরচ্ছে।"

"তুই থামবি?"

"তোর মুখের অবস্থা তো খুব খারাপ রে? সবটাই কি জ্যোতিষ্মানদার জন্য? নাকি অন্য কারণ আছে?" তখনই লিফট্ থেকে বেরিয়ে এল আয়েষাদি। আয়েষাদি এসেই

তো?" আয়েষা চায় যে, অভীক ভোটে দাঁড়াক। যদি জিতে যায়, অভীকের বউ হিসেবে তার ভাগ্যে আরও অনেক কিছু জুটবে। পলিটিক্যাল লিডারদের বউদের প্রবল সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি! কিন্তু তা বলে জ্যোতিষ্মানদার দেখাশোনা করতে পারবে না সে? মানুষের কি মাথা খারাপ হয়েছে যে, জ্যোতিষ্মানের ক্রোক্ব বলে তাদেরও নকশালপন্থী ভাববে? তাদেরও, যারা টাকার গদিতে বসে আছে আজ অর্ধ শতাব্দী? যারা বিদেশি গাড়ি চড়ে উচ্ছে কিনতে যায়? আয়েষা বলল, "আমি যাবই!"

অভীক বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে সোজা আয়েষার কোলা গালে এক থাপ্পড় মেরে বলল, "তুই হারামজাদি বাড়ির বাইরে এক পা রাখবি তো..."

চড় খেয়ে আয়েষা অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ তার সমস্ত শরীর জুড়ে কাঁপন দেখা দিল! সে বলল, "আমি আজই এবাড়ি

অভীক বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে সোজা আয়েষার ফোলা গালে এক থাপ্পড় মারল।

ছেড়ে চলে যাব!"

"যাবে যাও। তোমার মেয়েদের নিয়ে যাবে!" বলল অভীক। সে মুলত ঠান্ডা মাথায় বউকে শাসন করল, এই প্রথম।

"কেন, মেয়েদের কি আমি গোলক মাঝি লেন থেকে এনেছিলাম? মেয়েরা দু' চক্ষের বিষ? সেই বিষ কে ঢেলেছে আমার পেটে?"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌনতার চোরাস্রোত সব সময় প্রবহমান। শরীরের লেনদেন ফুরিয়ে গেলেও যৌন আকর্ষণ মরে গেলেও যৌন ধৃষ্টতা, যৌন বিকৃষ্ণা, যৌন কারুণ্য, যৌন বিদ্রোহটা থেকে যায়! এ একই মুদ্রার ওপিঠ মাত্র। আয়েষার এই বাক্যবাণে হঠাৎ অভীকের চোখের সামনে ভেসে উঠল রোগা-রোগা একটা মেয়ে, গোলক মাঝি লেনে থাকে। ভোরে উঠে দুধের বোতল হাতে ফেরে, হরিণঘাটার দুধ! রেশন তোলে, বাজার করে, একই সালোয়ার-কামিজ পরে রোজ কলেজে যায়। ভাল কিছু খেতে পারে না বলে রোজ ফুচকাই খায় গপ-গপ করে, তেঁতুল জল খায় চেয়ে-চেয়ে! অথচ দুর্গাপুজোর সময় লাল পাড় শাড়ি পরলে সেই মেয়েটাই হয়ে ওঠে অনবদ্য রূপসী! অভীকের মনে পড়ে যায় সব! এই মেয়েটাকেই একদিন গাড়ির মধ্যে চুমু খেতে গেলে মেয়েটা তাকে আঙুল তুলে বলেছিল, 'আগে বিয়ে করবে, তারপর গায়ে হাত দেবে! আমি গরিবের মেয়ে। আমার মা টাকা দিতে পারবে না, গয়না দিতে পারবে না। আমি আমার বরকে এই একটাই জিনিস দিতে পারব আর আমার কিচ্ছু নেই।' তারপর এই মেয়েটার শরীরের উপর সে কত সৌরাম্য করেছে। সেই মেয়েটা এরকম হয়ে গেল কী করে? থরে-থরে মেদ শরীরে। এত-এত খায়। মদ খেয়ে হুলুস্থুল বাধায়। মুখে সারাক্ষণ চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা, হাই প্রেশারের রোগী! অভীক বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলল, "এখনও তো বিষ ঢালতে ইচ্ছে করে! কিন্তু যা চেহারা বাগিয়েছ! বাঘের জন্য ঠিক আছে, পুরুষ মানুষ ছোঁবে না!"

আয়েষা চোখের জল মুছে বলল, "তাও আমি এখনও সবার চেয়ে সুন্দরী!" সত্যিই আয়েষার মধ্যে কোনও বিনয় নেই!

"ওই আনন্দেই থাক! তুমি পুরনোদের দলে চলে গেছে আয়েষা। পাড়ায় নতুন-নতুন বউরা এসেছে। পাড়ার ছোট-ছোট মেয়েগুলো হঠাৎ বড় হয়ে যাচ্ছে। তোমার মেয়েই তোমাকে সাত গোল দিতে পারে! তুমি লিস্ট থেকে বাদ পড়ে গেছ। তোমার জন্য শুধু আমিই আছি, এখনও।"

"তুমি একটা মিথ্যেবাদী, একটা মদ্যপ।"

"আর তুমিও আমার মদখোর, মাতাল বউ!"

কোথা থেকে কী হয়ে গেল! সারা সকাল আয়েষা আর অভীক বসে-বসে এরকম কথা চালাচালি করতে লাগল! কথার ফলাগুলোর ধার বসে গেল ক্রমশ। অভীক দু'-একবার ভাবল, উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। তারপর ভাবল, পরে হবে।

সেদিনই দুপুরবেলা মারা গেল জ্যোতিষ্মান। তখন নার্সিংহোমে পাড়ার কেউই ছিল না।

॥ ১২ ॥

সকাল, দুপুর, সন্ধে, কোনও সময়ই সোহিনীর কোনও কাজ থাকে না। তার কাজ মানে, নিজস্ব কাজ। নিজের জামাকাপড় গোছানো। ইস্ত্রি করা, আলমারি গোছানো। ওয়াক্সিং করা। চুলে প্যাক লাগানো। হয়তো বসে-বসে টাকা পয়সার হিসেব করল। ইস, এমাসে আট হাজার টাকা অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে কমলের কাছ থেকে। হাতে এখন পাঁচশো পড়ে। কমল কি আর দেবে? একটা লাইট ক্রিম না কিনলেই নয়। খুতুতুতো বোন বনির বার্থ ডে, কিছু দিতে হবে। কয়েকটা ব্লাউজ তৈরি করতে দেওয়া আছে রাসবিহারির 'লেডি ডায়না'য়, সে-ও প্রায় সাত আটশো টাকার ব্যাপার। সব মিলিয়ে এমাসে আরও হাজারপাঁচেক চাই-ই চাই! এসবই তার কাজ! তাও সেই কাজ সোহিনী কমল বাড়ি থেকে না বেরনো অবধি করে না। কারণ, ন'টা অবধি এই ঘর কমলের দখলে। কাগজপত্র গোছাচ্ছে। এটা ঘাঁটছে, ওটা নাড়ছে। স্নান করে, জামা-প্যান্ট পরছে। তারপর চুল আঁচড়াতে লাগল। ওরে বাবা, কমলের চুল আঁচড়ানো, সে এক ব্যাপার। এদিক নেই, সেদিক আছে। হুঁ, হুঁ! এই বয়সেই কমলের চাঁদিটা ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে গেছে বেশ। সেই ফাঁকা-ফাঁকা চাঁদিটা ঢাকার কি আপ্রাণ চেষ্টা কমলের! এদিকের চুল ওদিকে টেনে সাজাচ্ছে। পছন্দ হল না, আবার ঘেঁটে দিচ্ছে। জলের ছিটে দিয়ে আসছে, আবার এদিকের চুল ওদিকে টেনে সাজাচ্ছে। এক-একদিন হয় আর না। চিরুনিই ছুড়ে ফেলে দিল। দুম-দুম করে দু' ঘা লাথি মেরে দিল খাটের পায়ায়। উফ বাবা, কী ক্যাবলা! পুরুষমানুষের আবার অত চুল আঁচড়ানো কী?

আজকাল সোহিনী শুধু ভাবে, এই কমলকেই সে মনেপ্রাণে ভালবাসার চেষ্টা করেছিল। যা তা! যাক গে বাবা, তার চাকরিটা শেষ অবধি হয়ে গেছে সুশিক্ষায়তনে। পুজোর পর এক টিচার রিটায়ার করে যাচ্ছেন। তিনি যাবেন ২১ তারিখে। সোহিনী ঢুকবে ২২-শে। আর মাত্র চার মাস। তারপর সে চলে যাবে এই বাড়িটা থেকে। বাঁচা যাবে! তবে এই পাড়াটাকে সে মিস করবে খুব। যাওয়ার আগে শাঁটুলের সঙ্গে যে করেই হোক, একবার কথা বলতে হবে। মিট করতে

হবে। শাঁটুল না, গৌরচাঁদ।
গৌরচাঁদকে একদিন সোহিনী হেসে-হেসে বলেছিল কমলের চুল আঁচড়ানোর গল্প। তখন গৌরচাঁদ বলল, ও-ও অনেক সময় নিয়ে চুল আঁচড়ায়। আগে ও যখন আঁচড়াত, তখন ওর দাদাও চুল আঁচড়াতে আসত। একটাই আয়না তখন। ওর দাদার তখন ড্রেসিংটেবিল সুদ্ধ বউ আসেনি। আর তখন ওরা দুই ভাই পরস্পরকে কনুইয়ের গুঁতো মারত চুল আঁচড়াতে গিয়ে! আর মা বাজারের থলে হাতে দাঁড়িয়ে থাকত। যার আগে চুল আঁচড়ানো শেষ হবে সেই তো বাজারে যাবে।
গৌরচাঁদ বলেছিল, 'নর্থের ছেলেরা যে খুব চুল আঁচড়ায় নো ডাউট।
এক-একজনের পকেটে তিন-চার রকম চিরুনি।' সে বলেছিল, 'আমার কোনও বন্ধুবান্ধবকে পকেটে চিরুনি রাখতে দেখিনি তো?' শাঁটুল বলেছিল, 'সাউথে চুলে হাত চালিয়ে দিল, হয়ে গেল। ওরা কেয়ার ফ্রি। নর্থের ছেলেরা ওদের চুল, ওদের ড্রেসিং একটু পরিপাটি।' এই যে শাঁটুল ড্রেসিং বলল, এটাও নর্থিশ! তার শাশুড়িও বলে, 'খুব ড্রেস দিয়ে বেরচ্ছে।' আরও কত কি বলে এরা। সোহিনী নোট করে রাখবে। নইলে ভুলে যাবে! সে চট করে পুরনো কথা ভুলে যেতে পারে। নইলে সে প্রথম প্রেমিককে ভুলে কমলকে ভালবাসার চেষ্টা করল কী করে?
আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখেছে সোহিনী। আজ তার ঘুম ভেঙে যায় যখন সূর্যের আলো প্রায় ফোটেনি। সে ভাল করে চোখ না খুলেই বুঝতে পারে, পাশে শোওয়া কমলের নড়াচড়াটা একটু অন্য রকম। আধো চোখ খুলে সোহিনী দ্যাখে, কমল মাস্টারবেট করছে। সে চুপচাপ পড়ে থাকে। ঘুমের ভান করে। কমল একবার তাকায় তার দিকে, আলতো একটা ঠেলা দেয় তাকে। সে বিন্দুমাত্র সাড়া দেয় না। তখন কমল আস্তে করে তার হাঁটুর উপর উঠে যাওয়া নাইটি দু' আঙুলে ধরে আরও উপরে তুলে দেয়! সোহিনীর ত্রিকোণ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, যেন আকাশের নীচে দখলদারহীন পড়ে থাকে একটা বরীপ। সে বুঝতে পারে, কমল সেটার দিকে তাকিয়ে মাস্টারবেট করছে। এক সময় 'আঃ, আঃ' শুনতে পায় সোহিনী। কমল তারপর তার নাইটিটা নামিয়ে দেয় আবার।
সোহিনী আশ্চর্য হয়ে যায়! কী যে কমলের যৌন দর্শন, সে মাথা খাটিয়ে কের করতে পারে না! কিন্তু তার মনে হয়, কমল তাকে ব্যবহার করেছে। হয়তো দিনের পর দিন। সে টের পায়নি। চোখে জল চলে আসে তার। হাসিও আসে। দু'-আড়াই বছরের বিবাহে, পাশাপাশি শোওয়ায় সে প্রতিনিয়ত কমলকে জোর করেছে মিলিত হতে। সে ভেবেছে, সে-ই চেয়েছে। কমল চায়নি। কমল চায়নি। কিন্তু যা পাওয়ার পেয়ে গেছে। এটাই সত্যি। আজ মাসদু'য়েক সোহিনী আর কমলকে জোর করেনি। তাই কি কমল এভাবে মাস্টারবেট করছে? তার অজান্তেসারে তারই শরীর থেকে প্ররোচনা সংগ্রহ করছে? নিজের খিদে মেটাচ্ছে? কী গর্দভ! কিছু যায় আসে না। করুক যত খুশি মাস্টারবেট, করুক! কমল যতক্ষণে না বেরচ্ছে, সোহিনী নিজের হাতে সাজানো পাশের ঘরে বসে-বসে খবরের কাগজ পড়ে, বই পড়ে। আজ তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ মহুলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সোহিনী এগারোটা নাগাদ বেরবে। মিন্টো পার্ক যাবে, সুশিক্ষায়তনে। স্কুল বোর্ড কিছু কাগজপত্র জমা দিতে বলেছে। অরিজিনালগুলো শো করে অ্যাটেস্টেড জেরক্স দিয়ে আসতে হবে। হঠাৎ সোহিনীর মনে পড়ল, কোনও কাগজই অ্যাটেস্ট করানো হয়নি। কমলকে দিয়ে সই করাতে হবে। সে তাড়াতাড়ি শোওয়ার ঘরে এসে আলমারি থেকে কাগজ বের করল। কমল তখন ব্রিফকেস গোছাচ্ছে। সে কোনও গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই বলল, "এগুলো সই করে স্ট্যাম্প মেরে দাও।"
কমল দেখল কাগজগুলো, বলল, "কী হবে এগুলো?"
"সুশিক্ষায়তনে আমার চাকরিটা হয়ে গেছে।"
"তুমি চাকরি করবে? বাবা-মা'র পারমিশন নিয়েছ?"
"কোনও প্রয়োজন নেই।"
"তা ঠিক, চাকরি না করেই তো সারাদিন বাইরে-বাইরে ঘুরছ। আমার মনে হয় না, মা তোমাকে চাকরির অনুমতি দেবে।"
"ডু আই কেয়ার?"
"তুমি এবাড়ির বউ, আমি বাবা-মা'র সঙ্গে থাকি। বাবা-মা'র বাড়িতে। আমি বা তুমি, যা খুশি করতে পারি না।"
"তুমি তোমার মা'র বাধ্য থাকো। তাতেই উনি খুশি থাকবেন। ওঁর আমাকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই," তারপর সে থামল একটু, "তা ছাড়া চাকরিটা আমি এবাড়িতে থেকে করব না। আই অ্যাম লিভিং দিস হাউস বাই সেপ্টেম্বর। তারপর মাসছয়েক পরে ডিভোর্স ফাইল করব। তুমি নিশ্চয়ই ডিভোর্সটা দিয়ে দেবে! আর না যদি দাও, তো আমি কোর্টে গিয়ে লড়ব। আমার বাবা-মা'র আমার বিয়ে দেওয়ার টাকা ছিল। ডিভোর্স দেওয়ার টাকা নেই। ডিভোর্সের খরচ আমি চাকরি করে দেব।"
কমল বসে পড়ল খাটে, "আমি একটা ডিভোর্সি ছেলে হয়ে ঘুরব? লোকে বলবে, কমলের বউ ছেড়ে চলে গেছে?"
"এই জন্য তুমি বিয়েটা টিকিয়ে রেখেছ? মা গো! কেন? তুমি আবার বিয়ে করবে। কোনও আনটাচ্‌ডকে। তবে তোমার বিদ্যে দিয়ে পরীক্ষা করে নিও। নইলে ঠকতে পারো! তা ছাড়া তুমিও তো এখন সেকেন্ড হ্যান্ড হয়ে গেছ।"
"এদেশে মেয়ের অভাব নেই।"
"মেয়ের অভাব নেই। কিন্তু কুমারী মেয়ের অভাব আছে। তোমার তো আবার কুমারী না হলে চলবে না।"
কমলের পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল আপনাআপনিই কেমন উস্কোখুস্কো হয়ে গেল। তার জেরক্সগুলো নিয়ে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে ফেলল কমল, "তুমি একটা কালনাগিনী!"
"আর তুমি একটা ভণ্ড, হিপোক্রিট। আমার ম্যাক্সি তুলে মাস্টারবেট করতে লজ্জা করে না?"
"ইস, চিৎকার করছ? সবাই শুনবে!"
সোহিনী একটা ঠাস করে চড় মারল কমলের গালে, "খুব না? সাধু পুরুষ!"
কমল তার হাত ধরে টানল, "তুমি যাবে না। তুমি যাবে না। তুমি এখানে থেকে চাকরি করো। আই উইল ম্যানেজ।"
"না।"

কমল যতক্ষণে না বেরচ্ছে, সোহিনী পাশের ঘরে বসে-বসে খবরের কাগজ পড়ে, বই পড়ে।

'আমি তোমায় গোয়া নিয়ে যাব।'
"ইস, কমল এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছ মনে হচ্ছে।"
"আমি ডিভোর্সি তকমা গায়ে লাগাব না। সকলে হাসবে।"
"কোন যুগে পড়ে আছ? মেয়েরাই ডিভোর্স দিতে দু'বার ভাবে না।"
"এপাড়ায় একটাও ডিভোর্স হয়েছে? আমার ফ্যামিলিতে হয়েছে? আমার হবে? না।"
'মামাবাড়ির আবদার, ডিভোর্সি হব না!' সোহিনী কমলকে ভেঙাল, "আমি আর থাকব না তোমার সঙ্গে। আমার একটা ফিলিং তৈরি হয়েছিল তোমার প্রতি, সেটা আর নেই। ওয়াশিং আউট। ফ্রম মাই সিস্টেম।"
"মিথ্যে বোলো না। তুমি আমায় কখনও ভালবাসনি!" বলল কমল।
"এত দিন পর ভালবাসার খেয়াল পড়ল? তুমি তো একটা কমপ্লিট মেল শভেনিস্টি। তুমি তো একটা 'হোল' ছাড়া কিছুই বোঝ না। বাকি মানুষটা, তার মনটা?" সোহিনী আবার এনে দিল এক্টা জেরক্স।
কমল আর কিছু বলল না। সই করে স্ট্যাম্প মেরে দিল। তারপর বেরিয়ে গেল চেম্বারে।

মহুলের সঙ্গে দেখা হল সোহিনীর নির্দিষ্ট সময়ে। সে বেকবাগানের মুখটায় দাঁড়াল গিয়ে, মহুল এসে গাড়িতে তুলে নিল তাকে। যেতে-যেতে মহুলকে সোহিনী সকালের ঘটনাটা বলল সব। অবশ্য ভোরের ব্যাপারটা বলল না। যতই ফ্র্যাঙ্ক হোক, ভোরের কথাটা বলতে তার লজ্জাই লাগল।
সব শুনে মহুল বলল, "তা হলে তুই ফাইনালি ডিভোর্স নিবি ঘোষণা করলি? এবার যদি তোকে কমল বলে, এখনই চলে যাও?"
"চলে যাব।"
"তোরা মেয়েরা কিন্তু সাঙ্ঘাতিক। ভীষণ ডিফিকাল্ট! কলকাতায় এসে যত মেয়েকে দেখলাম, প্রত্যেকে কিন্তু নিজের জীবনটাকে কমপ্লিকেটেড বানিয়ে রেখেছে। তোর ইন্দ্রাণীকে মনে আছে? ওর প্রবলেমটা শুনবি? তোর চেয়ে ডিফারেন্ট। হাজব্যান্ডের সঙ্গে পটে না। তার অন্য গার্লফ্রেন্ড আছে। ও জানে সেটা। ওর অফিস কোলিগের সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার চলছে। সেই ছেলেটা আনম্যারেড। ওকে বিয়ে করতেও রাজি। তবু ইন্দ্রাণী নিজের বিয়েটায় ইতি টানছে না। কেন? না শ্বশুর-শাশুড়ি ভীষণ ভালবাসে আর বাবা-মা প্রচণ্ড হার্ট হবে। আর এভাবে শি ইজ স্পয়েলিং হার লাইফ। এসব অহেতুক টানাপোড়েনে তো নিজের কাজকর্মও নষ্ট হয়। স্পিরিটটাও নষ্ট হয়। কোনও সাদা মেয়ে এসব করবে না। যাকে ভলবাসে না তার সঙ্গে থাকবে না। আর বাঙালি মেয়েরা তো আরও ন্যাকা! এসব দেখে-টেখে আমি টায়ার্ড হয়ে গেছি ক'দিনেই!"
"লিন্ডবীর কী খবর?"
মহুল হঠাৎ বোম ফাটানোর মতো বলল তাকে, "লিন্ডবীকে আমি বিয়ে করছি না!"
"কেন?" অবাক হল সোহিনী, "সব তো ঠিক?"
"বানচাল করতে হবে! ওর একটা বয়ফ্রেন্ড আছে। এখনও তার সঙ্গে ঘোরে-ফেরে। ছেলেটা এখনও ওর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটায়। আরে, আমার কিছু যায় আসে না। ওর দশটা প্রেমিক থাকতে পারে। তাই বলে বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরও তাদের সঙ্গে রাত কাটাবে? গত উইকেও লিন্ডবী একটা ছেলের সঙ্গে কোলাঘাট গিয়েছিল! যে মেয়ের লিবিডো এত হাই, তাকে আমি ট্যাকল করতে পারব না সোহিনী। আমার এত ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া এ মেয়ে উইকএন্ড হলেই পাগলের মতো পার্টি করে, ড্রিঙ্ক করে। ভোর না হলে বাড়ি ফেরে না। তুই বিশ্বাস করবি না, প্রথম দিন আমার সঙ্গে বেরিয়ে কী পরিমাণ ড্রিঙ্ক করেছিল। কোনও কন্ট্রোল নেই। এসব খবর যখন থেকে পেতে শুরু করি, তখন থেকেই কেঁকে বসেছি। আমি আমার জীবনটা মেস করতে চাই না সোহিনী। সে যা ইচ্ছে করুক, আমার তাতে অসুবিধে নেই, কিন্তু তা বলে আমি তাকে বিয়ে করতে যাব না।"
"তোকে জোর করছে কে?"
"কে আর? বাবা!"
"কেন?"
"বাবার লিন্ডবীকে দারুণ লেগেছে! ও নাকি পরে দুর্দান্ত ব্যবসা সামলাবে। বাবা আসলে ঘুরিয়ে বলতে চায়, আমি ব্যবসা সামলাতে পারব না। বাবার ধারণা, আমার অত অ্যাম্বিশন নেই। এত বছর বিদেশে থেকেও আমি নাকি ভেতো বাঙালি টাইপ রয়ে গেছি!"
"তোর বাবাকে আমি কখনও দেখিনি!" বলল সোহিনী।
"আমি বাবাকে বলে দিয়েছি, ওই মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো, খুব বাজে হবে। আমার জব অফার আছে হার্কলে-তে, সোজা চলে যাব! চাই না তোমাদের সম্পত্তি। তা সত্ত্বেও বাবা ওদের বাড়ির সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছে! আমি বাবাকে কাল রাতে একটা এসএমএস করেছি, 'তোমার যখন এতই ভাল লেগেছে লিন্ডবীকে, হোয়াই ডোন্ট টু গো অ্যাহেড অ্যান্ড ম্যারি হার? আমার মাকে তো তুমি একবার ডিভোর্স দিয়েইছ, সেকেন্ড টাইম তো দিতে হবে না। অ্যান্ড দ্যাট অলার উওম্যান ইন ইয়োর লাইফ, শর্মিলা, আমাদের সকলের করুণার পাত্রী, শি ওন্ট কাম ইন ইওর ওয়ে।'"
"তুই এরকম এসএমএস করেছিস? তোর বাবা কিছু বলেননি?"
"না, এখনও না!"
"শর্মিলা করুণার পাত্রী কেন?"
মহুল গাড়ি চালাতে-চালাতে হাসল, রাসেল স্ট্রিট দিয়ে পার্ক স্ট্রিটে ঢুকল সেডানটা, "বাবা আদৌ মাকে ডিভোর্স দেয়নি! অন্তত আমার তাই ধারণা। বাবা-মা'র ইকোয়েশনটা আমি ঠিক জানি না। তবে প্রব্যাবলি শর্মিলার সঙ্গে বাবার বিয়েটা আইনসিদ্ধ নয়!"
সোহিনী চুপ করে রইল।
মহুলই বলল আবার, "আই হেট মাই ফাদার।"
ঠিক সাড়ে চারটের সময় চাঁদনি আর আহেলির ফ্লুরিজে পৌঁছে যাওয়ার কথা। মহুল আজ বান্ধবীদের ট্রিট দেবে। গাড়ি পার্ক করল মহুল পার্ক স্ট্রিটে।
সে হঠাৎ মহুলকে বলল, "তুই এত ভাল কেন রে?"
একটু ভুরু কুঁচকে তাকাল মহুল তার দিকে। পিক-পিক আওয়াজ করে গাড়িটা লক হয়ে গেল।
সোহিনী বলল, "দাঁড়া, তোর জন্য আমিই একটা মেয়ে দেখব। একটা শান্তশিষ্ট, ঘরোয়া, সুন্দর দেখতে মেয়ে, যার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই, সে নেশা করে না!"
"আর হাঁটুর নীচ অবধি পোশাক পরে না!" বলল মহুল।
"আর?"
"আর খুব হাসে।"
"আর?"
"আর রাগ করে না, কিন্তু অভিমান করে!"
"বাব্বা! আর কী?"
"আর? যার জীবনে আমিই প্রথম পুরুষ।" সোহিনীর মুখটা সঙ্গে-সঙ্গে কালো হয়ে যায়।
"তুই আমাকে শোনালি?"
"বিন্দুমাত্র না। আচ্ছা শোন, শোন সোহিনী, তোর জীবনেও তো কেউ একজন প্রথম পুরুষ ছিল? ছিল না?"
"হুঁ।"
"প্রতিটা মেয়ে, সে যতই স্বাধীনচেতা হোক না কেন, যতই পুরুষসঙ্গ করুক না

কেন, কেউ একজন তো তারও প্রথম পূজ্য হবে?"
সোহিনী মাথা নাড়ল।
"আমার প্রথম যাকে দিয়েছিলাম, তার আমি কত নম্বর ছিলাম, সে নিজেই জানত না। ফলে আমার প্রথমটা একদম মাঠে মারা গেল।"
সোহিনী ফুঁসে উঠল, "তোরা সব ক'টা এক, হিপোক্রিট! যা না, যা, তোর তো অনেক টাকা, যা গিয়ে সোনাগাছির কোনও পিম্পকে ধর। ধরে একটা নথ ভাঙা বুক করে আয়!"
মহুল বলল, "সর্বনাশ করেছে। তোর উত্তে হাত পড়ে গেছে! তুই নর্ম্ম ক্যালকাটার মেয়েদের মতো শাড়ির কুঁচি ধরে চেঁচাচ্ছিস কেন?"
সোহিনী বলল, "আমি তোর পয়সায় খাব না। আই উইল পে মাই বিল। রাসকেল!"
"কেন, তোর বরও তো আমার মতোই রাসকেল! তুই তোর বরের পয়সা নিস কেন?"
"আমার বর তো আমার বর!" সোহিনী চোখ বড়-বড় করে বলল কথাটা।
মহুল বলল, "তোর সব গুলিয়ে গেছে।" এসবের পরে হঠাৎই সোহিনী বলে উঠল, "শোন, শোন মহুল, আমাদের পাড়ার না একটা মেয়ে আছে, ডালিয়া। ঠিক তোর যেমন মেয়ে চাই, সেরকম মেয়ে। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি।"
'তোদের পাড়া মানে? মুন্সিয়ালি?"
"শ্বশুরবাড়ির পাড়া। যেখানে আই রিসাইড।"
"একটু ডেসক্রিপশন দে।"
"দাঁড়া, হতেতা আমার ফোনে ছবি থাকলেও থাকতে পারে। পুজোর সময় তুলেছিলাম। সিঁদুরখেলার দিন।"
"তুই সিঁদুরও খেলেছিলি?"
"অফকোর্স। হোয়াই নট।"
"তোর বিয়েটাই তো জমল না! তাতেও পাড়ায় সিঁদুর খেলছিস?"
"তো কী করব? বঙ্কিমচন্দ্রের আর শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মতো ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকব? কপালে করাঘাত করব?"
সোহিনী বলল, "উফ, সত্যি তো এবার সিঁদুর খেলাটা মিস করব! আরে, ওদিনই তো আয়েষা ঘোষের সঙ্গে আমার ফাটাফাটি কম্পিটিশন হয়।"
মহুল বলল, "ধুনুচি নাচের?"
সোহিনী একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল, "না, সাজের!" দু'-দু'বার সে দেখেছিল, আয়েষা লাল বেনারসি পরে, মাথা থেকে পা অবধি সোনার গয়না পরে, বাঁধনকেও ওরকম সাজিয়ে, লোকলস্কর পরিবৃত হয়ে সিঁদুর খেলতে হাজির হয়, যেন নবযুগের জমিদার গিন্নি! কী যে ভাবে নিজেকে! তাই সোহিনী এবার ৩০০ টাকা দামের সস্তা পাড় শাড়ি পরে, হাতে শুধু শাঁখা পরে ঠাকুর বরণ করতে গেছিল। আর সবাই আয়েষা ঘোষকে ছেড়ে তাকেই দেখলি অবাক হয়ে! ফোনে ছবি পাওয়া গেল ডালিয়ার দু'-তিনটে।
মহুল খুব খুঁটিয়ে দেখল সেগুলো এনলার্জ করে, "তুই শিওর, ওর কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই?"
"বিয়ের চেষ্টা চলছে জানি।"
"কী করে আলাপ করাবি?"
"প্ল্যান করতে হবে! আমি ওর বাড়িতে যাব একদিন। বলব, আমার এক বন্ধুর জন্য মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। বলব, ডালিয়ার ছবি দেখে পছন্দ হয়েছে।"
"মেয়েটা ফেসবুকে নেই?"
"আই ডোন্ট নো।"
"এটাই ভাল, আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আ গার্ল মাইসেল্ফ!" বলল মহুল, "আই ডোন্ট ওয়ান্ট মাই ফাদার টু ইন্টারফেয়ার।" ঠিক এই সময় চাঁদনি আর আহেলি হইহই করে ঢুকে এল ফ্লুরিঙ্গে। কত দিন পর দেখা! কথাবার্তা সব অন্যদিকে ঘুরে গেল। সোহিনীর মনে হল, সে স্কুল লাইফে ফিরে গেছে! তার জীবনে কোথাও কোনও সমস্যা নেই। এক ফাঁকে অবশ্য মহুল নিজের নোটপ্যাড থেকে ফেসবুকে গিয়ে ডালিয়া মুখার্জিকে খুজে বের করে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিল। মেসেজে লিখল, 'তোমার ছবি দেখলাম এক জায়গায়। তোমার সম্পর্কে আমি একটু জানি। ক্যান উই বিকাম ফ্রেন্ডস? অবশ্য ওটা একটা কথার কথা। তুমি বুঝতে পারবে।' মহুল নিজের ফোন নম্বরটা দিয়ে দিল মেসেজের সঙ্গে। আহেলি আর চাঁদনি ছ্যা-ছ্যা করল সব শুনে।
ওরা যখন মশগুল হয়ে গল্প করছে, তখন বাড়ি ফেরার পথে শর্মিলা একবার ফ্লুরিঙ্গ ঘুরে যাচ্ছিল। ফ্রাক্টেশন থেকেই হোক আর যাই হোক, আজকাল সে খুব নিজেকে ইনডালজ করছে। গোপনে রোজই এটা-সেটা খেয়ে ফেলছে সে। ওয়েট বাড়ছে তাতে। আদিত্য জিজ্ঞেস করলে শর্মিলা খুব আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলছে, 'তুমি শুধু আমাকে মোটাই ন্যাখো।' আজ তার ইচ্ছে করল, চিঞ্জ কেক খেতে। ফ্লুরিঙ্গে ঢুকতে গিয়ে সে দেখতে পেল মহুলকে।
মহুলকে সে বরাবর অন্যরকম ভাবত। কিন্তু আদিত্যর ছেলে হলে কী হবে, মহুল বোধ হয় একদম অন্য রকম। লিজ্বী নামের মেয়েটা, যাকে আদিত্য অলরেডি 'মিমি' না কী বলে আদর করে ডাকতে শুরু করে দিয়েছিল, যে মেয়ে নাকি আদিত্যকে বলেছে, 'আঙ্কল, আমি বিয়ের শপিং সব দুবাই থেকে করব' আর আদিত্য বলেছে, অ্যাকর্ডিং টু পরেশ, 'নো বিগ ডিল। আমরা সবাই যাব', সেই লিজ্বীকেও মহুল বিয়ে করবে না বলে দিয়েছে! লিজ্বীর মতো জংলি বিল্লি ওর পছন্দ নয়। ওর নাকি একটা সাধারণ মেয়ে চাই! শর্মিলা আর ভিতরে ঢুকল না। মহুল মেয়েগুলোর সঙ্গে বসে খুব হাসছে। তবে দেখলেই বোঝা যায়, ওরা পরস্পরের বন্ধু।
সে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাল কয়েক পলক মহুলের দিকে। মহুলের বয়সি ছেলে হয় না তার। তবু মহুল সম্পর্কে তো ছেলেই। সে হাঁটতে ল্যাগল গাড়ির দিকে। ওই লিজ্বীর বলে মেয়েটা নাকি একদিন সল্টলেকের বাড়িতে এসে আদিত্যকে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে। গুড বাই কিস। ইস! শ্বশুরকে কেউ চুমু খায়?
হাঁটতে-হাঁটতে শর্মিলা ভাবল, তার কখনও শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া হল না। সে কেমন বিচ্ছিন্ন আর একা হয়ে রয়ে গেল। পার্ক স্ট্রিটের জমজমাট সন্ধেবেলায় তার বুকটা খাঁ-খাঁ করে উঠল একথা ভেবে।

॥ ১৩ ॥

জ্যোতিষ্মানের কোনও উত্তরাধিকারী নেই। ফলে জ্যোতিষ্মান মারা যাওয়ার পর

সোহিনীর মনে হল, সে স্কুল লাইফে ফিরে গেছে! তার জীবনে কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

মকাইদের বাড়ি বিক্রিতে আর কোনও বাধা থাকল না। বাকি শরিকরা সব অনেক আগেই একমত হয়ে গিয়েছিল। এবার সকলে মিলে উঠে পড়ে লাগল ক্রেতা জোগাড় করতে। কিন্তু গোল বাধল অন্য জায়গায়। কোনও অশোভারই অন্য জনকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! এত বড় সম্পত্তি, দশ কাঠার উপর জমি। ছ'টা-সাতটা ভাগ, যে-সে প্রোমোটার নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। যে তরফ প্রোমোটার আনে, সেই তরফকে তার প্রোমোটার নানা প্রলোভন দেয়। নামে কম্প্রোমাইজ করতে বলে, শরিকদের রাজি করাতে বলে, বদলে একটা পার্সেন্টেজ দেবে বলে কথা দেয়। ফলে সব শরিকই দাবি করতে থাকে, তার আনা ক্রেতাই বাড়ি নিক। এবং বাড়ির দরও ওঠানামা করতে থাকে। এই ক্রেতাদের মধ্যে অভীকও পড়ে। মকাইয়ের সঙ্গে অভীকের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। মকাইকে অভীক ১০ লাখ বেশি দেবে কথা দিয়েছে। দাম দেবে তিন। কিন্তু অভীক কাউকে তাড়াতাড়ি করতে চায় শাঁটুল। দেলনকে সে হাতছাড়া করতে চায় না। সাউথের মেয়েদের প্রতি আর কোনও মোহ নেই শাঁটুলের। দেলন দমদম ক্যান্টনমেন্টের মেয়ে, বাঙালা। ওর মা আগে একটা স্কুলের সামনে বসে কাচের বাক্সে করে ঘুগনি, পরোটা, মাংসের কিমা এসব বিক্রি করত। এভাবে দুই ছেলে আর এক মেয়েকে মানুষ করেছেন ভদ্রমহিলা। এখন দিন এত খারাপ নেই। এক দাদার একটা রমরম করে চলা রোল কাউন্টার আছে দমদম মেট্রো স্টেশনের গায়ে। আর এক দাদা শাঁটুলের মতোই বাড়ি, ফ্ল্যাটের ব্রোকার। সেই দাদার নাম বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথদা খুব মাই ডিয়ার হচ্ছে। দেলনের সঙ্গে সে মিশছে, ঘুরছে, বেড়াচ্ছে, মলে যাচ্ছে, মাল্টিপ্লেক্সে যাচ্ছে, সব ঠিক আছে। কিন্তু সামনের বছরের মধ্যে বিয়ে কিন্তু করতে হবে, এক কথা বিশ্বনাথের। এসব মিলিয়ে শাঁটুলের চোখে এখন অনেক স্বপ্ন, অনেক চিন্তা। দেলনের মুখের মধ্যে একটা পবিত্রতা আছে। সেই পবিত্রতাটাই শাঁটুলের সবচেয়ে ভাল লাগে। সে নিজেকে বলে, বউ হবে দেলনের মতো। জ্বালা ধরিয়ে কেটে পড়বে না। দেলন থেকে যাবে তার পাশে সারা জীবন।

তার ভুরু উঠেই ছিল, অভীকদা বলল, "তুই আমার থেকে টু পার্সেন্ট নিয়ে নিস।"

"আর ওদের টু পার্সেন্টটা? সেটা তো মার যাবে!"

"আরে, ভাবছিস কেন? সেটা তোকে পুষিয়ে দেব। এখনই তো হবে না, পরে-পরে।"

শাঁটুল বলল, "সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু পার্টির সঙ্গে তো এদের ভাল যোগাযোগ হয়ে গেছে। আমি সরে গেলেই বা কী? পার্টি কেন ব্যাক করবে?"

"করবে। এদের বোঝাতে হবে, পার্টি মালকড়ি দেবে না ঠিকমতো।"

"কেন? সব তো ব্যাঙ্ক ক্লাফট দেবে কথা হয়েছে তো। বাড়ি ভাড়া করে থাকার খরচও দেবে!"

"কিছু একটা কর, তারপর আমি দেখছি।"

"উল্টোপাল্টা করা যাবে না। আমাকে এই লাইনে করে খেতে হবে। শাঁটুল দাসের একটা রেপুটেশন আছে।"

"বেশ। তুই শুধু একটা কাজ কর শাঁটুল। পার্টির সঙ্গে আমার একটা মিটিং করিয়ে দে। ব্যস!"

শাঁটুল ভাবল অনেকক্ষণ, "তোমার এত কী দরকার ওই বাড়িটা?"

"ভাল প্রপার্টি, আবার কী? তা ছাড়া আমার একটা কফি শপ খোলার খুব শখ বলতে পারিস। এরকম প্রাইম পজিশন না হলে চলবে না। পিছনটা হবে পার্কিং। লোতলাটা দুটো বিয়েবাড়ি ভাড়া দেওয়ার মত করে দেব। একদম ফাইভ স্টার বিয়েবাড়ি। পাড়া জমজমাট হয়ে যাবে। বিয়েবাড়িতে আলো জ্বলবে, ফুল দিয়ে সাজানো হবে, মিউজিক বাজবে, বাজি ফাটবে আর তিনতলা চারতলায় ছ'টা করে বারোটা ফ্ল্যাট! তুই আমার হয়ে কাজ কর। যা, তোকে সবসুদ্ধ আট দেব। ঠিক আছে?"

আট লক্ষ টাকা! শাঁটুল থুতনির ঘাম মুছে বলল, "সই হলেই দিয়ে দেবে তো?"

"হ্যাঁ রে, এসব নিয়ে ভাবিসই না।"

শাঁটুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজে লেগে পড়ল। জুন মাসে একদিন অভীক বসে গেল অন্য পার্টির সঙ্গে। কী ইকোয়েশন হল কে জানে, পার্টি এক মাসের মধ্যে জানিয়ে দিল, তারা আর ইন্টারেস্টেড নয়। এবার ঘোষালবাড়ির সিনে ঢুকল অভীক। ওই পার্টি সরে যাওয়ায় ঘোষাল শরিকরা একটু দুশ্চিন্তায় ছিল। এবার ওরা চট করে রাজি হয়ে গেল প্রোপোজালে। অগস্টের শেষে ঘোষালবাড়িতে রেজিস্ট্রীর বসিয়ে সই-সাবুদ করে ফেলল অভীক। আর সেদিনই আয়েষাদি তাকে হাত ধরে বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে মুখে মিষ্টি গুঁজে দিল।

এর পর থেকে আয়েষাদি সব সময় তাকে ডেকে কথা বলে। একদিন দেলনকে নিয়ে এসেছিল শাঁটুল ঘোষবাড়িতে। আয়েষাদি একটা দামি শাড়ি দিল। দেলনের তো বাড়ির ভিতরটা দেখে চক্ষুস্থির! একটা ঘর তো মাল্টিপ্লেক্সের গোল্ড ক্লাসের মতো। জাম্বো টিভি আর গদি আঁটা সোফা পাতা। কিন্তু সেদিন হুট করে একটা কথা বলে দিল আয়েষাদি, 'দেলনকে আমার খুব ভাল লেগেছে রে শাঁটুল। মুখটা দুর্গা প্রতিমার মতো। সোহিনীর চেয়ে দেলনকেই ভাল দেখতে। সোহিনীর মুখটা তো অতটা ভাল নয়, স্টাইলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল।'

ব্যস! সেই থেকে বেবাক মুশকিলে আছে শাঁটুল! দেলনের সেই এক কথা, কে সোহিনী বলো? আমার সঙ্গে সোহিনীর

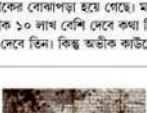

অগস্টের শেষে ঘোষালবাড়িতে রেজিস্ট্রার বসিয়ে সই-সাবুদ করে ফেলল অভীক।

ফ্ল্যাট-টাট দেবে না। যে যার টাকা নেবে, বাড়ি খালি করে দেবে। এদিকে শাঁটুলও ঢুকে পড়েছে এর মধ্যে। তার পার্টি ফ্ল্যাটও দেবে, টাকাও দেবে। বাকি শরিকরা একমতই চায়। এত বছরের পাড়া ছেড়ে আর যেতে হয় না তা হলে। শরিকরা কেউই খুব একটা প্রতিষ্ঠিত নয়। ঘোক টাকা আর ফ্ল্যাট, এটাই তাদের কাম্য। শাঁটুলের পার্টিই ঘন-ঘন মিটিং করতে লাগল ঘোষালবাড়িতে।

ব্যাপার অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পর অভীক একদিন শাঁটুলকে বলল, "তুই সরে দাঁড়া শাঁটুল।"

শাঁটুলের ভুরু উঠে গেল, বলে কী অভীকদা? সরে দাঁড়াবে? ডিলটা হয়ে গেলে দু' তরফ থেকে সে প্রায় ছ'-সাত লক্ষ টাকা কামাবে। এত দিনে সে যা জমিয়েছে, সব দিয়ে টিয়ে গম গুদামের ওখানে একটা ছোট ফ্ল্যাট হয়ে যাবে তার। তারপর সে বিয়ে করবে। বিয়েটা খুব

তুলনা করা হল কেন বলো? কেউ ফোন করলেই, সোহিনী ফোন করেছে? সোহিনীর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে? মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা শটিলের! আরে, সোহিনী সাউথের সঙ্গে লোলন তোর তুলনা হয় না! ওটা আয়েষাদির চুকলিবাজি। দিল সারা জীবনের মতো জল ঘোলা করে, এ জল আর থিতোবে কখনও? লোলন এমনি ভাল, কিন্তু টেরাও আছে খুব। অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে। কী বলবে শটিল? যে সে বউদিবাজি করেছে? পাড়ার বউয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে? আর সেই মেয়েটা তাকে দু'নিন নাচিয়ে ছেড়ে দিয়েছে? লোলনের বিশ্বাসটা একদম নষ্ট হয়ে যাবে না? এদিকে অভীকল তাকে অর্ধেক পেমেন্ট করে বাকিটা ঝুলিয়ে দিল। আয়েষাদির সঙ্গে পঙ্গাও নেওয়া যাচ্ছে না। আয়েষাদি সেদিন বলল, 'লোলনকে আর একদিন আনিস।' আর আনে? খতরনাক জিনিস! লালু ভাল বুদ্ধি দিল, 'বলে দে না, খায়। সঙ্গম নয়, এই চুমুটাই আপ্লুত করে তোলে সোহিনীকে। কমল তাকে এর পর আর একবারও বলেনি, 'তুমি যাবে না তো?' ইত্যাদি। সে একদিন বলে ফেলল, 'চলে যাব, তাই শরীরটাকে ভাল করে ভোগ করে নিচ্ছ?' কমল কোনও উত্তর দেয়নি।

সোহিনী বুঝতে পারে না কী করবে? তার মনে প্রশ্ন, এসব কমল করছে কেন? শুধু ডিভোর্সটা আটকাতে? ডিভোর্সি তকমার হাত থেকে বাঁচতে?

এর মধ্যে একদিন একটা ফেরিওয়ালা যাচ্ছিল ভরদুপুরে, অনু-রুণু দুই বোন ডাকল ফেরিওয়ালাটাকে। সাইকেলের উপর কাচের বাক্স। তাতে তুলোর বিছানা, ঝুটো দুল, পাথরবসানো আংটি, টিপের পাতা, সেফটিপিন, মাথার ক্লিপ, সুচ, সুতো রং-বেরঙের। তার কী হল, সে-ও ওড়না গায়ে জড়িয়ে নেমে এল নীচে। অনু-রুণুদের রকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে কিছু কিনল না। অনু-রুণু কিনল দুল, ক্লিপ এসব। তারপর অনু-রুণুর সঙ্গে গল্প করতে লাগল সে। ওরা দুই বোন সারাক্ষণ কিশোরকুমারের ক্যাসেট বাজায়। সেই গান, 'জানি যেখানেই থাকো/ এখনও যে তুমি/মোর গান ভালবাস', নির্জন হয়ে আসা পাড়া, শটিলের মোটরবাইক ছুটিয়ে চলে যাওয়া, বদিবাড়ির বউয়ের ছেলেকে পড়তে বসিয়ে, 'বল, বল, কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি, বল, বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি.' ফাঁকা অ্যাকোয়ারিয়ামটা, কর্পোরেশন কল থেকে সরু করে পড়ে যাওয়া জল — সব কিছু, সব কিছু কেমন মোহিত করে তুলল তাকে। মনে হল, সে এই পাড়ার একজন হয়ে গেছে!

তখনই অনু আর রুণু দু'জনে দু'জনের গায়ে হেসে ঢলাঢলি করে বলে উঠল, "অ্যাই সোহিনী, তোমরা এখন বাচ্চা নেবে না?"

"কবে নেবে বাচ্চা?" রুণু বলল।

"এখন চাও না, না?" অনু বলল।

"না, না, এখন না," রুণু বলল।

"হ্যাঁ, ফ্রি-লি ঘুরে-বেরিয়ে নাও।"

"বাচ্চা নিলেই তো হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, হয়ে গেল! পায়ে বেড়ি।"

সোহিনী বাড়ি ফিরতে লাগল পায়ে-পায়ে। একটা ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে আছে কল্লোলিনী লাইব্রেরির সামনে। দুটো কুলি নিঃশব্দে বই কার্টনে প্যাক করে তুলছে ম্যাটাডোরে। এত সব বই কোথায় যাবে? প্রশ্ন উঠল সোহিনীর মনে। সে শুনেছে কমলের কাছে বাড়িটা এবার ভাঙা হবে। মকাইরা সব যে যার মতো চলে গেছে কোথায়-কোথায়। ক'দিন ধরে লরিতে-লরিতে নিররাত মালপত্র গেছে ঘোষালবাড়ি থেকে। শুধু জ্যোতিষ্মান ঘোষালের খাট, টেবিল, টেবিল ফ্যানের কোনও পাখিদার ছিল না। অভীক লালুকে দিয়ে সেসব গোদাম তলার লোকদের দিয়ে দিয়েছে। সোহিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল! ১০০ বছরের পুরনো বাড়ি, ভাঙা হয়ে যাবে! ফোনে ছবি তুলে রাখবে সে, ফেসবুকে আপলোড করবে। সেপ্টেম্বরেই কান্তা বাঈ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। আপনা-আপনিই সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল সোহিনীর কাঁধে। দোতলা, তিনতলা করে সে সামলাতে চেষ্টা করল সব দিক। রান্নাঘরেও ঢুকতে হল তাকে। কান্তা বাঈকেও কিছু-কিছু সেবা করতে হল তাকে। কান্তা বাঈ খেতে চায় না। আর সে জোর করে খাওয়ায়। এই দুশ্চাট তার নিজেরই বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছিল!

সোহিনী বুঝতে পারে না কী করবে? তার মনে প্রশ্ন, এসব কমল করছে কেন? শুধু ডিভোর্সটা আটকাতে?

॥ ১৪ ॥

বাগবাজারের একটা মেয়ে, কয়েক দিন ঘুরেছিল ওর সঙ্গে। বিয়ে হয়ে গেছে।'

॥ ১৫ ॥

যেদিন সে ঘোষণা করেছিল চলে যাবে এবং ডিভোর্স ফাইল করবে সেদিনই রাতে কমল তার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি সহবাস করে। সোহিনী বাধা দিলে কমল একদম শোনেনি। কমলকে এই ভূমিকায় কোনওদিন দেখেনি সোহিনী! সত্যি বলতে, তার উপর জোর খাটানো হচ্ছে জেনেও সে পুরোপুরি এনজয় করেছিল ব্যাপারটা। তারপর রোজই নিজের পৌরুষ জাহির করতে শুরু করে কমল। এর মধ্যে তার জন্মদিনে কমলই তাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় মুন্সিয়ালি। তারপর সেখান থেকে সিনেমা এবং ডিনারে। এসব দেখে সোহিনীর থেকেও বেশি বিস্মিত কমলের মা, কান্তা বাঈ! আজকাল কমল চেম্বারে বেরনোর আগে তার কোমর জড়িয়ে চুমু ডালিয়াকে ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা খুলে দিয়েছিল বাঁধন। ডালিয়া তখন রোজ যেত দুপুরে আয়েষাদের বাড়িতে। দু'জনে ফেসবুক করত। ডালিয়ার নিজস্ব কম্পিউটার নেই, ইন্টারনেট নেই। বাঁধনের সঙ্গে আর আড্ডা হয় না। আয়েষার বাড়িতে ডালিয়া আর যায় না। তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা তার নিজেরই বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেল অচিরে। ফলে মহুলের মেসেজ এসে পড়ে রইল, ডালিয়া জানতেও পারল না। অগস্ট মাসেই বিয়ের কথাবার্তা এক জায়গায় পাকা হয়ে গেল ডালিয়ার। অঘ্রাণে দিন ঠিক হল। তখনই একদিন কী মনে হতে সাইবার কাফেতে গিয়ে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা খুলল ডালিয়া, এমনই-এমনই। মহুলের রিকোয়েস্টটা দেখল সে। মেসেজটা পড়ল। আর সে অন্যায়ে চিনতে পারল মহুলকে, বুঝতে পারল কী তার পরিচয়!

ডালিয়া কোনও উত্তর দিল না!

অলংকরণ: পিয়ালী বালা